নাগরিক উদ্যোগ বার্তা

অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা
এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০০৯

‘ফতোয়া’ ও দোররা’
মানবতা বিরোধী অপরাধ

জনগণের স্বাস্থ্য
অধিকার বনাম বাস্তবতা

প্রবাসী শ্রমিকরা কি
বিশ্বায়িত দুনিয়ার শ্রমদাস?

ভোক্তা অধিকার আইন:
শুভংকরের ফাঁকি

‘টিপাইমুখ বাঁধ’- প্রকৃতি
অবকাঠামো ও জনজীবনের
ভয়াবহ ক্ষতি করবে

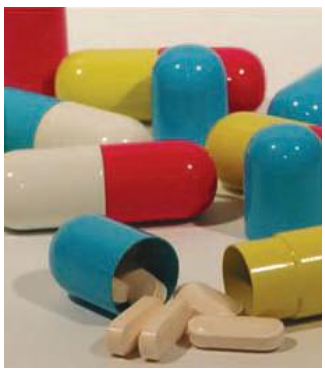

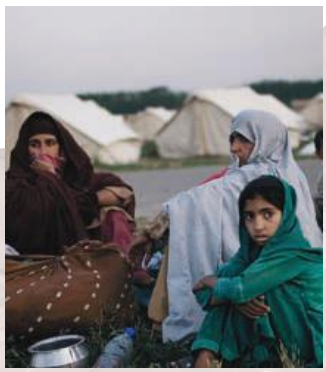

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG

সূচিপত্র

৫ ‘ফতোয়া’ ও ‘দোররা’ মানবতা বিরোধী অপরাধ

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীর অগ্রযাত্রা রোধে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বার বার ধর্মীয় অনুশাসনকে হাতিয়ার করেছে। ফতোয়া তেমনি একটি হাতিয়ার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হঠাৎ পর পর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ফতোয়া প্রদানের ঘটনাকেই কেন্দ্র করে লিখেছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি *আয়শা খানম*। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সারাবিশ্বে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও কেন এমনভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে তিনি তার কারণ অনুসন্ধানের দাবি করেছেন আলোচ্য নিবন্ধে।

১৮ ‘টিপাইমুখ বাঁধ’ প্রকৃতি অবকাঠামো ও জনজীবনের ভয়াবহ ক্ষতি করবে

সম্প্রতি ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ নিয়ে সারাদেশে আলোড়ন চলছে। গড়ে উঠেছে পক্ষে বিপক্ষে নানা মতামত। এই টিপাইমুখ বাঁধের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাগরিক উদ্যোগ বার্তার সাথে কথা বলেছেন বাপার সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. আব্দুল মতিন।

৯ ভোক্তা অধিকার আইন: শুভংকরের ফাঁকি

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সারা বিশ্বে গড়ে উঠেছে ভোক্তা অধিকার আন্দোলন। আমাদের দেশেও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে গত ১ এপ্রিল ’০৯ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ আইন। এই আইনের পর্যালোচনা করেছেন দ্য কনজ্যুমার্স ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য *মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন*।

২১ জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর উপর প্রভাব

জলবায়ুর বৈশ্বিক পরিবর্তনের কারণে ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ। বাড়ছে খরা, ঝড়, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস, বন্যাসহ নানা রোগব্যাধি। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি নারীর জীবনে কী প্রভাব ফেলে তার বিশে-ষণমূলক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন গবেষক *নাজরিয়া ইসলাম* ও *দ্বিজেন মলি-ক*।

৩ জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার বনাম বাস্তবতা

স্বাস্থ্য প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণায়ও স্বাস্থ্যকে জনগণের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি, দায়িত্বে অবহেলা, অব্যবস্থপনা, অদক্ষতা প্রভৃতি কারণে এদশের অধিকাংশ মানুষ ন্যূনতম স্বাস্থসেবা প্রাপ্তির অধিকার বঞ্চিত। নেই কোন জাতীয় নীতিমালা। এই বিষয়ে লিখেছেন শশাঙ্ক বরণ রায়।

আরো যা আছে

যৌন হয়রানি রোধে হাইকোর্টের নির্দেশাবলীর প্রয়োগ	৭
সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন	১০
তথ্য অধিকার আন্দোলন: রাজস্থানের অভিজ্ঞতা	১১
ডারবান সম্মেলন ও দলিত অধিকার আন্দোলন	১৩
সোয়াতে শরিয়াহ আইনের নামে মৌলবাদী কর্তৃত্ব	১৫
প্রবাসী শ্রমিকরা কি বিশ্বায়িত দুনিয়ার শ্রমদাস	১৬
নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এবং নারীর জন্য বরাদ্দ	২৩
বই পর্যালোচনা	২৫
গণমানুষের সাংস্কৃতিক সহযোদ্ধা ‘উদীচী’	২৮
সমকালীন মানবাধিকার লংঘন চিত্র	২৯
ইউপিআর বিষয়ে জাতীয় মতবিনিময় সভা	৩০
নাগরিক উদ্যোগের কার্যক্রম	৩১

নাগরিক উদ্যোগ বার্তা

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
সোমা দত্ত

সম্পাদকমণ্ডলী
বৃত্বা রায়
অমিত রঞ্জন দে
মাহাবুবা সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মিঠু আহমেদ

প্রকাশক
নাগরিক উদ্যোগ
৮/১৪, ব-ক: বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৮৬৮
ফ্যাক্স: ৯১৪১৫১১
ইমেইল:nu@bdmail.net
ওয়েবসাইট: www.nuhr.org

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টার্স এন্ড সাপ-াই
৪৮/এ/১, বাড্ডা নগর লেন
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

দাম
১৫ টাকা

সম্পাদকীয়

mgvÿ` kxq

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
মানবাধিকার রক্ষায় কতটা কার্যকর হবে?

মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ পাস হয়েছে। এই আইনের নানা দুর্বলতার কারণে কমিশন শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার রক্ষায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে, সে বিষয়ে সন্দিহান মানবাধিকার কর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞরা। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অনেক সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে নানা সময়ে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাহীনতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং সীমাহীন সরকারি নিয়ন্ত্রণ এগুলোকে কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। নব গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রেও উলে-খিত সীমাবদ্ধতাগুলোর আশংকা করা হচ্ছে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকবে। সাত সদস্যের বাছাই কমিটিতে বিরোধী দল থেকে শুধু একজন সদস্য থাকবেন। তাই এ ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা কতটা রক্ষা হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎ বলে দেবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই কমিশনের ক্ষমতা বেশিভাগই সুপারিশ কেন্দ্রিক। ১২(ঙ) ধারায় বলা হয়েছে, 'মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাঁধাস্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।' ১৪(২)-এর ক ধারায় বলা হয়েছে, 'মানবাধিকার লংঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্যকোন কার্যধারা দায়ের করিবার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে।' আবার ১৪(২) এর খ ধারায় বলা আছে, 'মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করিবে।' ১৯(১) ধারায় আছে, কোন অভিযোগের তদন্তের পর সত্য প্রমাণ হলে কমিশন সংশি-ষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবে। তবে উলে-খ্য, সরকার কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করতে বাধ্য নয়। ১৯(৪) ধারায় এই বিষয়ে বলা আছে– '...যদি সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষ কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশের সহিত মতপার্থক্য থাকে অথবা সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয় বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে উক্ত মতপার্থক্য, অসমর্থতা বা অস্বীকারের কারণ উলে-খ করিয়া উপরিউক্ত সময়সীমার মধ্যে কমিশনকে অবহিত করিবে।' তবে এক্ষেত্রে কমিশনের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আইনে সুস্পস্টতা নেই। তাছাড়া ১৮(১) ধারায় শৃংখলা বাহিনীর দ্বারা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি কমিশনের ক্ষমতার আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। অথচ আমরা দেখি মানবাধিকারের লংঘনের ঘটনা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সবচেয়ে বেশি ঘটে। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আমিরুল কবীর চৌধুরী বলেছেন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের তদন্তও মানবাধিকার কমিশন করবে। তার এইরূপ প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়িত জরুরি।

জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার বনাম বাস্তবতা

স্বাস্থ্য সুযোগ নয়, অধিকার

স্বাস্থ্য জনগণের অধিকার। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, ভাষা, ভৌগলিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে এ অধিকারের আওতাভুক্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সরকার তার নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা করা [আর্টিকেল ১৫ (ক)]; সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা অসুস্থতাজনিত কিংবা বৈধব্য, অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার [আর্টিকেল ১৫ (ঘ)] প্রতিষ্ঠা; এবং জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মাদক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে [আর্টিকেল ১৮ (১)] সাংবিধানিকভাবে বাধ্য।

এছাড়াও বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘোষণা-প্রতিশ্রুতিতেও স্বাস্থ্যকে জনগণের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অনুসারে জনস্বাস্থ্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)'তে সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি স্থান পেয়েছে। বৈশ্বিক পরিসরে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং আলমা আতা ঘোষণা, সিডও সনদ প্রভৃতিতে স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে উলে-খ করা হয়েছে এবং স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র জনগণের এ অধিকার বাস্তবায়ন করবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দলিলগুলোতে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিশ্ব সমাজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যচিত্র

বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের বাস্তব চিত্র খুব একটা গবেষণা করে বের করার প্রয়োজন হয় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে সকলেরই এ বিষয়ে কিছুটা ধারণা আছে। আর একটু এগিয়ে সংবাদপত্র দেখলে আরও সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তৃত চিত্র মেলে। কোন ধরনের বিতর্কের সম্ভাবনা না রেখেই একথা বলা যায়, দেশের স্বাস্থ্যচিত্র মোটেও সুখকর নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত, যতটুকু পায় সেটাও মানসম্মত নয়। কিছু তথ্যে বিষয়টির প্রতিফলন দেখো যেতে পারে– হাসপাতালে ১টি বেডের বিপরীতে মানুষের সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক। ৪ হাজার ৫০০ জন মানুষের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ১ জন। শহর পর্যায়ে ৫২ শতাংশ লোক চিকিৎসকের নিকট গেলেও গ্রামে যায় মাত্র ২৮ জন। ৮০ শতাংশ মা সন্তান জন্ম দেন দক্ষ চিকিৎসক, ধাত্রী বা স্বাস্থ্য কর্মীর সহায়তা ছাড়াই। গর্ভধারণ ও সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বছরে ১২ হাজার অর্থাৎ দিনে ৩৩ জন নারী মারা যান। দেশের ছয় থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুদের শতকরা ৮৫ ভাগ রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। পুষ্টিহীনতায় প্রতিবছর মারা যায় ২.৫ লাখ শিশু। কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এক-তৃতীয়াংশ। পুষ্টিহীন শিশু (৫ বছরের নিচে) ৪৮ শতাংশ। দেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করে ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ। ব্যবহারকারীর মাত্র ৫ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ। (সূত্র: চাইল্ড সারভাইভারস, বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি-২০০৮, ইউনিসেফ; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ; বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৮, নিপোর্ট; বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা)। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর অব্যস্থাপনা, ভুল চিকিৎসা আর প্রতারণার এক ভয়াবহ চিত্র।

দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশই যে স্বাস্থ্যসেবা পায় না দারিদ্র্য এর বড় কারণ হলেও পাশাপাশি রয়েছে নানা ধরনের বৈষম্য। গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, আদিবাসী-বাঙালি, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য বিদ্যমান। অন্যদিকে পথ শিশু, ছিন্নমূল মানুষ, ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, চা শ্রমিক, পাহাড়, সমুদ্র উপকূল, নদী তীরবর্তী, চর, হাওর প্রভৃতি দুর্গম এলাকায় অধিকাংশ জনগণ ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা থেকে চরমভাবে বঞ্চিত। যৌনকর্মী, হিজরা, দলিত-সহ অন্যান্য সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে।

স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন ধারা

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা দেশে সেবা প্রদানের মূল ধারা। সারা দেশে সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামো রয়েছে। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন বিশেষায়ীত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা করছে সরকার। দেশের স্বাস্থ্যসেবা

গ্রহণকারীর অধিকাংশ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করে। সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য খাতে জনবল, ঔষধ, অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তারও পুরোটা ব্যবহৃত হয় না দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, দায়িত্বে অবহেলা প্রভৃতি কারণে।

এনজিও পরিচালিত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বাংলাদেশের একটি দ্রুত বিকাশমান খাত। এনজিওগুলো মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সেবা প্রদান করছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দেশের উপজেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বৃহদায়তন হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। মফস্বলে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা না পেয়ে অনেকে যেমন বেসরকারি ক্লিনিকে সেবা গ্রহণ করে একই সাথে উন্নত সেবার প্রত্যাশাও তাদেরকে সেখানে নিয়ে যায়। বড় শহরগুলোর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মানুষ বেসরকারি হাসপাতালে যায় উন্নত সেবার প্রত্যাশায়। একটি বড় সংখ্যায় বেসরকারি ক্লিনিক-হাসপাতাল পরিচালিত হলেও এগুলোর সেবার পরিধি, মান ও মূল্য নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। এসকল প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। সরকারিভাবে এসকল প্রতিষ্ঠানের তদারকির জন্য তেমন কোন নীতিমালা এবং ব্যবস্থাপনা নেই।

এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা সর্বাধিক মাত্রায় গ্রহণযোগ্য ধারা হলেও দেশে ইউনানী, আয়ুর্বেদী, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী চিকিৎসা বিদ্যমান। এর সাথে রয়েছে বিশ্বাস নির্ভর বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি। যেমন, ঝার-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, পীরের পানি-তেল পড়া, মানত প্রভৃতি। চরম দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের একটি বড় অংশ বিশ্বাস নির্ভর চিকিৎসা গ্রহণ করে অথবা বলা যায়, গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

ইউনানী, আয়ুর্বেদী ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও উনবিংশ শতাব্দিতে এসে 'আধুনিক' চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে প্রায় একই অবস্থা হোমিওপ্যাথির। বর্তমানে বিকল্প ধারা হিসেবে পরিচিত এই পদ্ধতিগুলো অধুনা বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের দেশে ইউনানী, আয়ুর্বেদী ও

> সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য খাতে জনবল, ঔষধ, অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে তারও পুরোটা ব্যবহৃত হয় না দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, দায়িত্বে অবহেলা প্রভৃতি কারণে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিকাশে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা, ঔষধ উৎপাদন এবং মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এ ধারা থেকে অনেকের জন্য উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বিপরীতে ইউনানী-আয়ুর্বেদী পদ্ধতিতে চিকিৎসার নামে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রত্যাবর্তন

আওয়ামী লীগের গতবারের শাসনামলে গ্রামীণ জনগণের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জনগণের সাথে অংশিদারিত্বের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক বিনামূল্যে সেবা দেবে এটা ছিল তখনকার পরিকল্পনা। এর আওতায় জনগণ ক্লিনিক স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় জমি প্রদান করে এবং জমি দাতা ও স্থানীয় মানুষদের নিয়ে যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ব্যবস্থা রাখা হয়। সরকার ১৯৯৮ সালে ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য স্থির করে এবং শেষ পর্যন্ত ১০ হাজার ৮২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে। ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর নীতিগত পরিবর্তন আনা হয় এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে চার দলীয় জোট সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এনজিওদের কাছে ইজারা প্রদান এবং সেবার বিনিময়ে ফি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এগুলো চালু হচ্ছে।

নীতিহীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

স্বাধীনতার প্রায় চার দশক অতিক্রান্ত করার পরও আমাদের দেশে একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এরশাদের শাসনামলে একটি স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে পেশাজীবী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সেটিকে গণবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি হিসেবে চিহ্নিত করে। তাদের প্রবল বিরোধিতা, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং সরকার পতনের ফলে স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০০০ সালে একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হয়েছিল। সেটির বাস্তবায়ন শুরু হলেও ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর সে প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সরকার মেয়াদের শেষদিকে ২০০৬ সালে একটি নতুন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে ২০০৮ সালে একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত বছরের আগস্ট মাসে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির একটি খসড়া (হালনাগাদ) সংস্করণ প্রকাশ করা হলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে।

একটি দেশের অগ্রগতির জন্য সে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য এটি আরও বড় সত্য। দেশের অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এ বাস্তবতায় সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়নে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান ও পরিসর বাড়াতে হবে। একই সাথে এনজিও পরিচালিত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে যাতে দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার থাতে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে একটি নীতিমালার আওতায় এনে সেবার মান, মূল্য ও পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। p

শশাংক বরণ রায়: উন্নয়নকর্মী

‘ফতোয়া’ ও ‘দোররা’

মানবতা বিরোধী অপরাধ

হঠাৎ করেই পরপর বেশ কতগুলো ফতোয়া দেওয়ার ঘটনা ঘটে গেল। গত ৭ জুন ’০৯ শ্রীমঙ্গলে ও সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধুবলি মেহমানশাহী গ্রামে, ৪-৫ জুন ’০৯ সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশে, ৩০ মে ’০৯ হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার দীঘলবাক ইউনিয়নে এবং ২৪ মে ’০৯ কুমিল-ার দাউদকান্দি উপজেলার বিটেশ্বর ইউনিয়নে। এক মাসেই এত ঘটনা। ঘটনাগুলো হলো কোন না কোন অভিযোগের অজুহাতে নারীকে গলায় জুতা পরানো, ১০১, ৩০৩ দোররা মারা, এমনকি ধর্ষণের শিকার, নির্যাতনের শিকার নারীকে আবার বেত্রাঘাতের শাস্তির সম্মুখীন হতে হলো। দোররার আঘাতে কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কয়েক জনের শারিরীক অবস্থা এমন হল যে, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

এসব ঘটনার বহু প্রতিবাদ হয়েছে। প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদ হয়েছে, তাৎক্ষনিক চিকিৎসা ও আইনানুগ ব্যবস্থার পদক্ষেপ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের ক্ষেত্রে এ ধরনের পদক্ষেপ দ্রুত নেওয়া হয়েছে। ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আনা হয়েছে।

কয়েকটি নারী ও মানবাধিকার সংগঠন এ ক্ষেত্রে দ্রুতই সক্রিয় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সহায়তা ও সেবা প্রদান চলছে। মানবিক সাহায্য চলছে ।

২০০৯ সালে যখন বাংলাদেশের অগ্রসরমানতার নানা চিত্র সর্বত্র তুলে ধরি- মনে সাহস পাই বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সুফিয়া কামালদের মতো বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে আসছে, দু হাতে আঁধার ঠেলে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এ ধরনের সংবাদে মনে আঘাত পাই, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয় মন, লজ্জিত ও অপমান বোধ করি। প্রশ্ন জাগে নিজের মনে নিজেদের কাজের দুর্বলতা-ব্যর্থতার কথা ভেবে। এও ভাবি একি শুধু নারী আন্দোলনের একার ব্যর্থতা? অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠনের কি কিছুই করার নেই? নারীকে কোন না কোনভাবে হেয় করা, অপমানিত, লজ্জিত ও অধঃপতিত করে রাখা, দৈহিক-মানসিকভাবে নির্যাতন করার সঙ্গে শতাব্দী পর শতাব্দী গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি, পশ্চাৎপদ সমাজ মনোভঙ্গিও জড়িত। একটি সমাজ গ্রামেই হোক আর শহরেই হোক যখন নারীকে জুতার মালা পরিয়ে পুরো এলাকায় ঘোরানো হয় অপমান করার জন্য, তখন সেই সমাজের বা গোটা রাষ্ট্রের কি কোন অপমান হয় না? এটা কি সব নাগরিক তথা রাষ্ট্রের জন্য অপমানকর ঘটনা নয়? আমাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি কী শিক্ষা দেয়?

কেন এ ধরনের ঘটনা হঠাৎ এত বেড়ে গেল? আর কীভাবেই বা এর প্রতিকার- প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়? এটা সত্য যে এ ধরনের ঘটনার প্রকাশ্য সূচনা নব্বইয়ের দশকে। মৌলভীবাজারের ছাতকছড়ার নুরজাহানকে পাথর ছুড়ে মারা হয়, প্রতিবাদে নুরজাহান আত্মহত্যা করে। ফরিদপুরের আরেক নুরজাহানকে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে তার স্বামী ও তার শত আপত্তি সত্ত্বেও আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। মধুপুরে নুরজাহানকে পুড়িয়ে মারা হয়, এরপর দু ’এক বছর এ ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে। তখনও প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। মহিলা পরিষদ, মানবাধিকার সংগঠন, সচেতন নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, আইনজীবী ও অন্যদের সহযোগিতায় আইনি লড়াই পরিচালনা করে এবং নির্যাতনকারীর শাস্তি দিতে সক্ষম হয়।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে অর্ধশতাধিক নারী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯ জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তো কয়েক দশক ধরে নির্বাচিত হয়েছেন একাধিক এলাকা থেকে। এছাড়া ১৯৯৭ সাল থেকে উপজেলায় তিনটি সংরক্ষিত পদে ৩ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে ১২ শতাধিক গ্রামীণ সমাজের নারী নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও অংশ নিয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার নারী।

এবার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হলেন ৪৭০ জন নারী। তাছাড়া পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলেন আরও ৪৫ জন নারী সংসদ। অর্থাৎ জাতীয় সংসদে বর্তমানে ৬৪ জন নারী সংসদ। যদিও তাদের কাজ, কাজের নির্দিষ্ট এলাকা এসব মৌলিক বিষয় এখনও নির্ধারিত হয়নি তথাপি এটা বাস্তব সত্য, বাংলাদেশের রাজনীতিতে, রাজনৈতিক দলে, রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীরা ক্রমেই অধিকহারে এগিয়ে আসছেন এবং সমাজ ও তার রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রের নাগরিক (শহর-গ্রাম) সবাই তাদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করছেন। নারী দ্বারা তারা পরিচালিত হচ্ছেন, নারী নেতৃত্ব আন্তরিকভাবে মেনে নিচ্ছেন। কয়েক দশকে বাংলাদেশের নারীরা শতসহস্রমুখী প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক পেশায়-কর্মকাণ্ডে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকহারে অংশগ্রহণ করছেন। অর্থনীতির চাকাকে সচল করতে এদের অবদানও বাড়ছে। পরিবারে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা বাড়ছে এবং তা স্বীকৃতি লাভ করছে। এসব স্বীকৃতির ভিত্তিতে আইনগত সংস্কার হচ্ছে। গত দুই তিন দশকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নারীর মানবাধিকার সহায়ক আইনও হয়েছে। বর্তমানে ৪/৫ জন নারী (দেশের ইতিহাসে এই প্রথম এত বেশি সংখ্যক নারী) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের সমাজ-রাষ্ট্রে নারীর এই ক্রমঅগ্রসরমান ইতিবাচক পরিবর্তনমুখী বাস্তব চিত্রের সঙ্গে সম্প্রতি ক্রমেই ঘটে যাওয়া নারীকে ফতোয়া দেওয়া, দোররা মারা, ৩০৩ বেত্রাঘাত করাসহ নানা ধরনের চরম নিগ্রহ নির্যাতন ও শাস্তিমূলক আচরণের পরিস্তিতি অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা সমাজমানসে ভয় ও পশ্চাদপসরনের মনোভাব সৃষ্টি করে।

এই ন্যাক্কারজনক চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক ঘৃণিত-বর্বর পাশবিক ঘটনাগুলো কি কেবল সামসাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্বিক পশ্চাদপদতার জন্যই ঘটেছে? নাকি এসবের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, নারীর মানবাধিকার বিরোধী গোষ্ঠীর কোন ধরনের যোগসূত্র আছে কি না তা সরকারি প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে। এগুলো কি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে বিশৃঙ্খল করে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলার কোন প্রচেষ্টা? গত ৮-৯ বছরে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী, নানা ধরনের সন্ত্রাসীচক্র গণতন্ত্র, মানবাধিকার বিরোধী গোষ্ঠী যেভাবে রাজনৈতিক- প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা নিয়ে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও সমাজ মানসে তাদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেছে তার প্রভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। এ বিষয়ে নারী আন্দোলন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও সোচ্চার ও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা প্রয়োজন। তবে এ মুহুর্তে প্রধান ও বড় প্রয়োজন সরকারি প্রশাসনের জোরালো পদক্ষেপ।

ঘটনার পর নির্যাতনের নারীকে আইনি, চিকিৎসাগত সামাজিক-মানসিক সাহায্য দিতেই হবে, তবে তার চেয়ে বড় প্রয়োজন এ ধরনের ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে যার যার অবস্থান থেকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সরকার, সংসদ, মন্ত্রীসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা– সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে, পেশায়-প্রশাসনে সর্বত্র সক্রিয়, সাহসী, দায়বদ্ধ, দায়িত্বশীল নারীদের উপস্থিতি। অন্যদিকে একই সময়ে একই দেশের সমাজ ও পরিবারে বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজ জীবনে নারীদের এ ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বর পাশবিক নির্যাতন। যা অনেক সময়েই সহস্রমুখী অগ্রসর বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি তথা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে অগ্রসর ধারাকে অনেকটা বাঁধাগ্রস্থ ও ম্-ান করে দেয়। এসব ঘটনা কি অগ্রসরমুখী বাংলাদেশের উন্নয়নের সূচক নির্ণয় ও উন্নয়ন পরিমাপ ধারায় দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরী করে না? এ প্রশ্ন আজ বাংলাদেশের সমাজচিন্তকদের, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়নবিদ, রাজনীতিবিদ তথা রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে। এ প্রশ্ন সাধারণ মানুষ , সচেতন নাগরিকদের কাছে। এ প্রশ্ন যেসব এলাকায় অতীতে ও বর্তমানেও এসব ঘটনা ঘটছে, তাদের কাছে। তারা কেন এখনও এলাকায় নিজস্ব প্রতিবাদ সচেতন, সংগঠিত, এলাকাগত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন না? যতটুকু প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তা আমার মতে যথেষ্ঠ নয়। আরও জোরালো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠা প্রয়োজন। যাতে করে ফতোয়াবাজরা এ ধরনের কাজে সাহস না পায়। p

আয়শা খানম: সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সূত্র: সমকাল

লেখা আহ্বান

'নাগরিক উদ্যোগ বার্তা' নিয়মিতভাবে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকারসংশি-ষ্ট বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে মননশীল ভাবনা-চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, সাক্ষাৎকার, সমালোচনা, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, সংগঠন এবং ব্যক্তির ইতিবাচক কর্মপ্রচেষ্টা তুলে ধরার চেষ্টা করে প্রতি সংখ্যায়। এ বিষয়ে আপনার লেখা দ্রুত পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। পাশাপাশি পত্রিকা সম্পর্কে যেকোন গঠনমূলক সমালোচনাও আমাদের প্রয়াশ সার্থক করবে।

যৌন হয়রানি রোধে হাইকোর্টের নির্দেশাবলীর প্রয়োগ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত হয়নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীভিত্তিক বৈষম্য যেভাবে আমাদের সমাজকে আজও বেঁধে রেখেছে, ঠিক সেভাবেই নানান স্তরে জড়িয়ে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য; কখনো তা প্রকট কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে। যদিও সামগ্রিক পরিস্থিতি একটু একটু করে হলেও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিগত কয়েক দশক ধরে নারী আন্দোলনের চাপে বাংলাদেশ নানাভাবে নারী বিরোধী বৈষম্যের বিভিন্ন দিক স্বীকৃত ও চিহ্নিত হয়েছে। এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি রোধের লক্ষ্যে হাইকোর্টের নির্দেশাবলী। এক যুগান্তকারী রায়ে হাইকোর্ট গত ১৩ মে '০৯ এই নির্দেশাবলী জারি করেন।

সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশঙ্কাজনকভাবে যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রধান কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। এ নিয়ে প্রতিবাদী শিক্ষার্থীদের অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ৭ আগস্ট কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশুদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য দিক নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী জনস্বার্থে হাইকোর্ট বিভাগে রিট করেন। এই প্রেক্ষাপটে হাইকোর্ট বিভাগ উলি-খিত রায় প্রদান করেন।

নির্দেশাবলীর উলে-খযোগ্য দিক

এই প্রথম–ক. যৌন হয়রানিকে নারীর মানবাধিকার লংঘন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে; খ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নারীর ওপর যৌন নিপীড়ন আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে; গ. যৌন হয়রানির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে; ঘ. হয়রানির ঘটনা বিচারের ক্ষেত্রে হয়রানি বা নিপীড়নকারীর উদ্দেশ্যে ও মানসিকতার বদলে আক্রান্ত নারীর মানসিক যন্ত্রণা ও নির্যাতনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; ঙ. শুধু কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নয়, রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে যেকোন ধরনের অশালীন উক্তি, কটূক্তি করা, কারও দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানো প্রভৃতিকেও যৌন হয়রানি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তার জন্যও শাস্তির কথা বলা হয়েছে; চ. রায়ে যৌন নিপীড়ন ও শাস্তি সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করা এবং কার্যকর শাস্তির বিধান করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

আদালতের নির্দেশাবলী

এই নির্দেলাবলী বা রায় পালন সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। এগুলো প্রয়োগের লক্ষ্যে পদক্ষেপ না নিলে তা আদালত অবমাননার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; ২. এগুলো যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও শাস্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ব্যবস্থা। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে এই নির্দেশাবলীকে বিস্তৃত করা সম্ভব; ৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দায় কর্তৃপক্ষের। তেমন ঘটনা ঘটলে তার শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার দায়ও কর্তৃপক্ষের; ৪. হাসপাতাল ও সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত ধরনের সরকারি ও বেসরকারি কর্মপ্রতিষ্ঠান এবং পথে চলাচলকারীও এই নির্দেশাবলীর আওতাভুক্ত; ৫. সরকারি বেসরকারি যেকোন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সকল নারীই এর অন্তর্ভুক্ত হবেন– তিনি বেতনভোগী, সম্মানিকী. স্বেচ্ছাসেবী, উচ্চপদস্থ, ঠিকা শ্রমিক– যেমন কর্মীই হোন না কেন।

যে সমস্ত ব্যবহার যৌন হয়রানি বলে গণ্য হবে

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক যেকোন ধরনের নির্যাতন যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে। এছাড়া যে কোন অবাঞ্ছিত– যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা রসিকতা; খ. গায়ে হাত দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা; গ. ই-মেইল, এসএমএস, টেলিফোনে বিড়ম্বনা; ঘ. পর্নোগ্রাফি বা যেকোন ধরনের অশ্লীল ছবি অথবা দেয়াল লিখন; ঙ. অশালীন উক্তিসহ আপত্তিকর কোনো ধরনের কিছু করা, কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলা; চ. কোন নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ করা; ছ. মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন, যৌনসম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ, জ. অন্য যেকোন শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ, যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা

ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির দায়ভার বহুদুর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রের ওপর ন্যস্ত থাকায়, সেখানে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা ও জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি ঘটতে পারে বিভিন্ন স্তরে– সহপাঠী দ্বারা সহপাঠিনীর উপর; শিক্ষক দ্বারা ছাত্রী, নারী শিক্ষকদের ওপর; শিক্ষা কর্মচারী দ্বারা ছাত্রী, শিক্ষিকা বা নারী সহকর্মীদের উপর; প্রশাসনিক পদাসীন ব্যক্তি দ্বারা ছাত্রী, শিক্ষিকা বা নারী শিক্ষাকর্মী; বহিরাগত দ্বারা ছাত্রী, শিক্ষিকা বা নারী কর্মচারীর উপর; ইত্যাদি।

ছাত্রী নিপীড়নকারীদের শাস্তির দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন
ছবি: মাহবুব হোসেন নবীন

অথচ এমন এক পবিত্রতার আবরণে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেখি যেখানে যৌন হয়রানি আদৌ ঘটতে পারে বলেই আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। বাস্তবতা যদিও ভিন্ন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নের ঘটনা ক্রমে বেড়ে চলছে। এগুলোকে 'ইভ টিজিং' বলে উড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন দরকার।

> নারীর শরীর, গতিবিধি এমনকি তার পুরো জীবনের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একটি অন্যতম হাতিয়ার যৌন নিপীড়ন বা হয়রানি। হাইকোর্টের দেওয়া নীতিমালা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

যৌন হয়রানি প্রতিকারে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া বাধ্যতামূলক

অভিযোগ শুনানির জন্য একটি অভিযোগকেন্দ্র থাকবে। এই অভিযোগকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ন্যূনতম পাঁচসদস্যের একটি কমিটি থাকবে। কমিটির প্রধান হবেন একজন নারী। এ ছাড়া কমিটিতে একাধিক নারী সদস্যও থাকবেন। কমিটি কোন অভিযোগ পেলে তদন্ত ও অনুসন্ধান শেষে পুলিশের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাবেন। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী বিচার বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। নির্যাতন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও এবং পুলিশের কাছে অভিযুক্তকে সোপর্দ করার আগে নির্যাতিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক সরকারি দপ্তরকে এ বিষয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন জমা দিতে হবে; চাকরির নিয়মকানুন এমনভাবে বদলে নিতে হবে যাতে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে; বহিরাগত কোন ব্যক্তি যৌন হয়রানি ঘটালেও তার বিরুদ্ধে শাস্তির যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে; যৌন হয়রানির ধরন যদি ফৌজদারি দণ্ডবিধির নিরিখে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষকে আদালতে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে; অভিযোগ শুনানি ও দাখিলের সময় অভিযোগকারী বা প্রত্যক্ষদর্শীর ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করা চলবে না; যৌন হয়রানির ভুক্তভোগী কোন কর্মী প্রয়োজনে নিজের বা দোষী ব্যক্তির বদলির জন্য আবেদন করতে পারবে।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ বাধ্যতামূলক

নারীর শরীর, গতিবিধি এমনকি তার পুরো জীবনের উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একটি অন্যতম হাতিয়ার যৌন নিপীড়ন বা হয়রানি। এই ধরনের নির্যাতন নারীর কাজ করার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতাও বটে। হাইকোর্টের দেওয়া এ নীতিমালা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সহায়ক হবে। ফলে নারীর কাজের প্রতিবন্ধকতা দূর, নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী পাচার বন্ধসহ নানা প্রকার হয়রানি হ্রাস পাবে। অভিযোগ কেন্দ্র ও তদন্ত কমিটির ফলে অপরাধীদের মনে ভয় থাকবে। তাই কর্মস্থলে নারীরা যাতে বৈষ্যমের শিকার না হন, সে জন্য সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা; নিয়মিত আলোচনাসভা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন; নারীর উপযুক্ত সম্মান ও সুযোগ সৃষ্টি এবং নারীকর্মীদের সামগ্রিক অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

হাইকোর্টের নির্দেশাবলী অনুসারে অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রাসঙ্গিক সার্কুলার জারি করবে বলে আমরা আশা করি। আমাদের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করতে হবে এবং সবাইকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নকারীকে চিহ্নিত করা এবং এর প্রতিরোধ সম্ভব হবে। p

চিররঞ্জন সরকার: কলামিস্ট ও উন্নয়নকর্মী

ভোক্তা অধিকার আইন:
শুভংকরের ফাঁকি

ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সারা বিশ্বে বর্তমানে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘ স্বীকৃত সাতটি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ভোক্তা অধিকার আন্দোলন। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দাবি আদায়ের জন্য বিভিন্ন সংগঠন কাজ করছে। প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে কার্যকর রয়েছে ভোক্তা অধিকার আইন। কিন্তু বাংলাদেশে ভোক্তাদের দুর্ভোগ দিন দিন চরম আকার ধারণ করছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে প্রতিনিয়ত। ভাল মানের পণ্য সহজে পাওয়া যায় না। ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ, নিম্নমানের পণ্য কিনে প্রতিদিন প্রতারিত হচ্ছে মানুষ। সঠিক তথ্য না জানা, যুগপোযোগী আইন না থাকা, ভোক্তাদের অসংগঠিত অবস্থা এর অন্যতম কারণ।

দেশে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে গত ১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন। বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ক একটি আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন মহল সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে আসছিল। কারণ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রণীত আইনগুলোই মূলত এতদিন বহাল ছিল। তবে এগুলোরও কার্যকর প্রয়োগ অনেকটা করা হয়নি। পাশ হওয়া আইনটি মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ' আকারে জারি করেছিল। সামান্য কিছু সংশোধনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার আইনটি পাশ করেছে।

সত্যিকার অর্থে খসড়া আইনে ভোক্তা স্বার্থে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটা দেখার সুযোগ সাধারণ জনগণের ছিল না। অবশ্য অধ্যাদেশটি জারি হওয়ার আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খসড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনটি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে তা দেয়া ছিল। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের যেহেতু ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই তাই অধিকাংশ জনগণ কোন মতামত প্রদান করতে পারেননি। আর যাদের এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ আছে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ পাশকৃত আইনে ভোক্তাদের স্বার্থের অনেকগুলো বিষয়ই উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

প্রথমত: ভোক্তা অধিকার কমিশনের পরিবর্তে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়েছে আইনে। এই পরিষদে ২৯ সদস্যের মধ্যে ১৫ জনই সরকারের প্রতিনিধি। যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। কারণ এ পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকার ও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। এতে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও যথাযথ প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্ব দেয়ার অবকাশ থাকবেনা। এই ধরনের পরিষদে সাধারণত আমলাদের প্রাধান্য দেয়া হয়। আরও উদ্বেগের বিষয় যে, প্রস্তাবিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ আইনে একটি নির্দিষ্ট ভোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য ভোক্তা সংগঠনগুলোর ভূমিকাকে কার্যত খাটো করে দেখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এটি একটি দুর্বল আইন হিসেবে পরিগণিত। কারণ এই আইনের বিধানাবলী সংশি-ষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের কোন বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে বলে বলা হয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় যেমন ছয় থেকে বার মাসের জন্য হতে পারতো। এরপর সমসাময়িক বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর এর বিধানাবলী কার্যকর হইবে এভাবে উলে-খ থাকলে আইনটির প্রাধান্য থাকতো।

তৃতীয়ত: এই আইনে বলা হয়েছে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন জেলাকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে। এই বিধান নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে ব্যাহত করবে।

চতুর্থত: এই আইনের অধীন ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যের অভিযোগে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোন মামলা সরাসরি দায়ের করা যাইবে না বলে বিধান রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে কোন ভোক্তা বা অভিযোগকারী মহাপরিচালক বা মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। এতে ভোক্তাদের প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ একেবারেই সীমিত থেকে যাবে।

পঞ্চমত: পাশকৃত ভোক্তা সংরক্ষণ আইনে বলা হয়েছে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিসেবা খাতে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা মহাপরিচালক গ্রহণ করিবেন না; তিনি সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করিবেন মাত্র। এই সেবা খাতেই ভোক্তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অথচ আইনে এখানে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। এছাড়াও আইনটিতে আরও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। সংজ্ঞায় সেবা খাতের নামগুলোর অস্পষ্টতা, বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের মুখাপেক্ষী থাকাসহ নানাবিদ দুর্বলতা রয়েছে। যে আইনটি পাশ হয়েছে ভোক্তা অধিকার আইনের নামে এটিও শুভংকরের ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয় বৈকি।

প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর ভোক্তা অধিকার কমিশন গঠন করার বিধান করা হলে ভোক্তারা উপকৃত হতো। স্বাধীনভাবে এই কমিশন যদি ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং এর আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয় তাহলে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকতো। বলা বাহুল্য যে, ভোক্তা অধিকার আইন প্রণয়ন করলে হবে না ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি এ কাজে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে গণমাধ্যম। ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদেরও এব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করা দরকার। দুর্নীতিবিরোধী জাগরণ সৃষ্টিতে সুশীল সমাজ যে জোরালো ভূমিকা পালন করছে - ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সুশীল সমাজকে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণ ঠকতে চায় না, প্রতারিত হতে চায় না। চায় নিরাপত্তার ও জানার অধিকার, অভিযোগ ও প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই পণ্য কেনার অধিকার, ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার, শিক্ষা লাভ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার। আর এ অধিকারগুলো নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ কমিশন আইনের বিকল্প নেই। p

মোহাম্মদ ইমাম উদ্দিন: প্রতিষ্ঠাতা সদস্য,
দ্য কনজ্যুমার্স ট্রাস্ট

সুশাসন ও জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশের সংবিধানে এই দেশের নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাই প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে সকল কার্যক্রম জনগণের সেবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তথ্য প্রদান না করার একটা সংস্কৃতি আমাদের অস্তিত্বের মাঝে বাসা বেঁধেছে। তবে বর্তমানে অন্যান্য সকল অধিকারের মত তথ্য অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে। কারণ জনগণের অন্যসব অধিকারের সাথে তথ্য জানার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের এবং তার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সেবা পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত থাকতে হবে। তাহলেই জনগণ অধিকার বঞ্চিত হবে না, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

বর্তমান বিশ্বে যে যত তথ্য জানে সে তত ক্ষমতার মালিক। সুতরাং অন্যের তথ্য বেশি করে জানা এবং নিজের কাছে সংরক্ষিত তথ্য কুক্ষিগত করে রাখার এক ধরনের প্রবণতা সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্বব্যাপী চলমান। এই ধারা ভাঙার একটা চেষ্টা শুরু হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিলসহ বেশ কিছু দেশের জনগণ তথ্য অধিকার পাওয়ার জন্য আন্দোলন করেছে এবং করছে। তাদের দেশে ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। সে সমস্ত দেশের জনগণ তথ্য অধিকার আইনের সুফলও পাওয়া শুরু করেছে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমরা, বাংলাদেশের জনগণও একটি তথ্য অধিকার আইন পেলাম। তবে আইনটির গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অনেকটা অন্ধকারে। আইনের যথাযথ সুফল পেতে আইন, আইনের ব্যবহার ও এর সুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। কিন্তু জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব নিবে কে? কে এই আইনের জটিল অংকের সমাধান করে তাদের সামনে সহজতরভাবে তুলে ধরবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই সবচেয়ে বড়

ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশে একটি শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম গড়ে উঠেছে। তারা এই আইনটিকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজটি করতে পারেন। তারা যদি এ আইন প্রয়োগের ফলে দেশের কোন স্থানে কী ধরনের ঘটনা ঘটছে, নাগরিকরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন, কোথা থেকে কি দুর্নীতি বা অনিয়মের খবর প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধরেন তাহলে জনগণ এই আইনের কার্যকারিতা বুঝতে পারবে এবং ক্রমান্বয়ে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

আইনটি যেভাবে প্রণীত হয়েছে, তাতে জনগণের প্রকৃত আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ত থেকে গেছে। তারপরও আমরা সাধুবাদ জানাই এই আইনকে। আমরা মনে করি, এই আইনের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পরিবর্তন-পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে জনগণের আকাঙ্খার সাথে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হবে।

জনগণের অধিকার রক্ষায় নব গঠিত তথ্য অধিকার কমিশনেরও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তাদেরকে প্রথমত: এ আইনের ব্যাপক প্রচারে সরকারের বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগানো এবং বেসরকারি গণমাধ্যমগুলোকেও এ বিষয়ে সচল ও সক্রিয় করার দায়িত্ব নিতে হবে। দ্বিতীয়ত: কোন ব্যক্তি কোথাও তথ্যের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলে তার অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে তথ্য প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা এবং তৃতীয়ত: সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যে ধরনের অবকাঠামো থাকা দরকার তা গড়ে তোলার জন্য সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ অব্যাহত রাখা।

এক্ষেত্রে বড় এক প্রশ্ন হলো এই আইনটিকে নিয়ে উন্নয়ন সংগঠনসমূহ কি ভাবছে? আইনটি যেভাবে প্রণীত হয়েছে, তাতে জনগণের প্রকৃত আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ত থেকে গেছে। তারপরও আমরা সাধুবাদ জানাই এই আইনকে। আমরা মনে করি, এই আইনের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পরিবর্তন-পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে জনগণের আকাঙ্খার সাথে সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হবে। তাই এ মুহূর্তে আসল কথা বা একমাত্র কথা এই আইনের ব্যবহারে যাওয়া। যত বেশী ব্যবহারের যাওয়া যাবে আইনটি ততবেশী কার্যকর হবে। সেজন্যে সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। গ্রাম থেকে নগর, একেবারে ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেন্দ্রীক সমস্যা থেকে শুরু করে জাতীয় যে কোন ধরনের ইস্যুতে এ আইন ব্যবহারে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন প্রসঙ্গে সরকারের সদিচ্ছার একটি প্রতিফলন আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পাশাপাশি একটি তথ্য অধিকার কমিশনও আমরা পেয়েছি। তবে কেবলমাত্র সরকারের সদিচ্ছা, আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন করলেই হবে না। জনগণকেও তার অধিকারের প্রশ্নে সচেতন ও সরব থাকতে হবে। তাহলেই আমরা যে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি, রাষ্টের কাছে যে সুশাসনের প্রত্যাশা করি তা অনেকখানি পূর্ণতা পাবে। আজকে যে সীমাহীন দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল সর্বত্র বিরাজ করছে তা ভেঙে ফেলতে তথ্য অধিকার আইন নতুনমাত্রা যোগ করবে। গ্রামের মানুষ, শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষসহ সর্বস্তরের মানুষ জানুক রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্রের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে তার কী অধিকার আছে এবং সে কীভাবে তা পেতে পারে। তাহলে সেই তার অধিকার নিজেই ছিনিয়ে নিতে পারবে। p

অমিত রঞ্জন দে: নাগরিক উদ্যোগে কর্মরত

তথ্য অধিকার আন্দোলন

রাজস্থানের অভিজ্ঞতা

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক পাহাড় ও মরুভূমির রাজ্য রাজস্থান। এই রাজ্যের একটি জেলা বিলওয়ারা। পাথুরে পাহাড়ময় শুষ্ক এলাকা। অধিকাংশ জমি চাষের অযোগ্য। চাষ যোগ্য জমি যা আছে সেখানেও বছরে মাত্র একটা ফসল ফলে, বর্ষাকালে। খুবই সামান্য কিছু জমিতে বছরে দু'টি ফসল হয়। তাই বছরের অধিকাংশ সময় এই এলাকার মানুষের কোন কাজ, কোন রোজগার থাকে না। এসব দরিদ্র লোকের অন্ন সংস্থান নিশ্চিত করতে সরকার থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়। স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, বনায়ন ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কাজের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের রোজগার নিশ্চিত ও খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করে সরকার। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের দুঃখ লাঘবের জন্য গৃহীত এসব প্রকল্পের সরকারি অর্থে সুবিধাভোগীরা লাভবান হচ্ছিল। তাই একসময় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন এক মহিয়সী নারী অরুণা রাও। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ (আইসিএস)

কর্মকর্তা। তিনি দেখলেন সরকারের উচ্চ পদে থেকে এসকল বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি চাকরি ছেড়ে সাধারণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়ালেন। তিনি সাধারণ মানুষকে এসকল অন্যায় ও অবিচার থেকে রক্ষা করতে সরকারি সকল কাজের হিসাব, বাজেট, মাস্টার রোল সহ সকল তথ্য জনগণকে জানানোর দাবি তুললেন। 'হাম জানেঙ্গে হাম জিয়েঙ্গে' ও 'হামারা পেইসা হামারা হিসাব'– শে-াগানে তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয় সকল তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন।

এই প্রসঙ্গে একটি আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। একটি কাজে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি থেকে ৬০০ রুপি কম দেয়া হয়। শ্রমিকরা তাদের পুরো পারিশ্রমিক দাবি করেন। কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষ পুরো মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে বলে জানায়। শ্রমিকরা খাতা দেখতে চায়। কর্তৃপক্ষ তাদের হাতিয়ার ব্রিটিশ প্রবর্তিত 'অফিসয়াল সিক্রেসি এক্ট' এর দোহাই দিয়ে খাতা দেখাতে অস্বীকৃতি জানায়। কাজেই পাওনা আদায়ের জন্য শুরু হয় আন্দোলন। আন্দোলন অনশনে রূপ নেয়। অনশন ভাঙার জন্য পুলিশ বাহিনী আসে, কয়েকজনকে আটক করে, জোতদার তার বাহিনী লেলিয়ে দেয় কিন্তু আন্দোলন থামে না। জোতদারেরা এই আন্দোলন থামানোর জন্য প্রায় ২ লক্ষ রুপি খরচ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের সেই ৬০০ রুপি মজুরি পরিশোধ করতে হয়।

শোন গড় আন্দোলন:

অরুণা রাও ও তার সঙ্গীদের উলে-খযোগ্য আরেকটি আন্দোলন শোন গড় আন্দোলন। শোন গড় একটি দরিদ্র গ্রাম। এক ভূস্বামী এই গ্রামের সকল জমির মালিক বলে নিজেকে দাবি করে। কৃষকের ফলানো সকল ফসলের অর্ধেক তার ঘরে তুলে দিতে হয়। এমন কি অন্যভাবে সংগৃহীত সকল কিছুর অর্ধেকের ভাগ দিতে হয় এই ভূস্বামীকে। তার রয়েছে নিজস্ব লাঠিয়াল বাহিনী। প্রভাবশালী হওয়ার কারণে প্রশাসন ও তার পক্ষে। এই গ্রামের এক ভুক্তভোগী ব্যক্তি লাল সিং যোগাযোগ করেন অরুণা রাও ও তার সহযোগিদের সাথে। তারা তখন ভূস্বামীর বিরুদ্ধে সাধারণ মজদুর-কৃষকদের সচেতন ও সংগঠিত করতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার মানুষ প্রথমে তাদের আহবানে সাড়া দেয় না। কারণ এই ব্যবস্থাকে তারা নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে। অব্যাহত চেষ্টার ফলে মানুষ আন্দোলনে সোচ্চার হয়। প্রশাসন ও লাঠিয়ালদের সাথে লড়াই শুরু করে। অব্যাহত আন্দোলনের মুখে প্রশাসন তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়। শোনগড়ের ভূমিতে সাধারণ কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে কিষাণ মজুরদের আন্দোলনের ফসল হিসেবে গড়ে ওঠে একটি সংগঠন 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংঘ' (এমকেএসএস)। অরুণা রাও তাদের নেতা। পৌড়ত্বেও অসম্ভব প্রাণশক্তি ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী এই মহিয়সী নারী এলাকার মানুষের কাছে দেবদুত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ব্যক্তিগত সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে দেবদুঙরীর মাটির ঘর থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের। তাদের নানা আন্দোলনের ফলে রাজস্থান সরকার ২০০২ সালে এবং ভারত সরকার ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে। প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের সকল ধরণের তথ্য জানার অধিকার।

বিজয়পুরা পঞ্চায়েত: তথ্য উন্মুক্তকরণের একটি মডেল

আইন পাশের পর সবার তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও সরকারি-বেসরকারি অনেক সংগঠন নিজ স্বার্থে তথ্য প্রদান করছিল না। এমকেএসএস- এর কর্মীরা সকলের সামনে তথ্য উন্মুক্তকরণের একটি উদাহারণ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়। তারা বিজয়পুরা পঞ্চায়েতের পরবর্তী নির্বাচনে সারপাঞ্চ (চেয়ারম্যান) ও সদস্য প্রার্থীদের সাথে যোগাযোগ করে এবং নির্বাচনে বিজয়ী হলে পঞ্চায়েতের সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে বুঝায়। তাদের আহবানে সাড়া দেন কালু নামের একজন সারপাঞ্চ ও কয়েকন সদস্য প্রার্থী। তারা নির্বাচিত হলে কীভাবে পঞ্চায়েতের কার্যক্রম চলবে, জনগণকে তারা কী সেবা দেবে এমন সকল প্রতিশ্রুতি লিখে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ ও প্রচার করে। বলার অপেক্ষা রাখেনা, নির্বাচনে এই প্রার্থীরা বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। সারপাঞ্চ কালুর নির্বাচনী ব্যয় ছিল সাকুল্যে মাত্র ৮০০০ রুপি। অপর দিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা প্রত্যেকে ১ লাখ থেকে ১.৫ লাখ রুপি ব্যয় করে। তাদের সেই নির্বাচনী ইশতেহার এখনো মুদ্রিত আকারে বিজয়পুরা পঞ্চায়েত অফিসে টাঙানো আছে। তাদের প্রতিশ্রুতি মত সরকারের প্রদত্ত প্রতিটি টাকা জনগণের উন্নয়নে সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে। পঞ্চায়েতের সকল তথ্য সকল জনগণের জন্য সবসময় উন্মুক্ত। সকল খাতা-পত্র, বিল-ভাউচার, মাস্টাররোল, বাজেট, হিসাব বিবরণীসহ সকল তথ্য যেকোন জনগণ যেকোন সময় দেখতে পারে। এছাড়া এই পঞ্চায়েতের বিগত বছরসমূহের খরচের হিসাব, বাজেট এবং যে সকল সেবা, মানুষ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পাবে তা প্রকাশ্য স্থানে খোলা দেয়ালে রং দিয়ে লেখা আছে। জনগণের কাছে সরাসরি জবাবদিহির জন্য আছে গণশুনানীর ব্যবস্থা। যেখানে সরকারি ও জনগণের সমন্বিত একটি প্রতিনিধি দলের কাছে সব হিসাব দিতে হয়।

রাজস্থানের তথ্য অধিকার আন্দোলনের অগ্রপথিক অরুণা রাও এর সাথে নাগরিক উদ্যোগের প্রতিনিধি দল

রোজগার গ্যারান্টি:

রাজস্থানে দরিদ্র মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা করতে সরকার প্রতি বছর প্রতি পঞ্চায়েতে ১.৫ কোটি রুপি বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এটি রোজগার গ্যারান্টি নামে পরিচিত। পূর্বে সরকারি বরাদ্দের এই টাকা সঠিকভাবে মানুষের হাতে পৌঁছাতো না। এর শতভাগ সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছানো এবং এই ব্যবস্থা স্বচ্ছ করতে একটি পদ্ধতি চালু করেছে বিজয়পুরা পঞ্চায়েত। তারা এলাকার শ্রমিকদের জন্য জবকার্ড ইস্যুর ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি পরিবার থেকে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই কার্ড পায়। যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ইউনিটের একজন এই কার্ড পায়। জবকার্ড গ্রহণকারীর কাজ ও মজুরির হিসাব তার কার্ডে উলে-খ থাকে। অনুরূপ একটি কার্ড পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছেও থাকে। এই কার্যক্রম অনুসারে প্রত্যেক কার্ডধারী এক মৌসুমে ১০০ দিনের কাজ পাবে এবং দৈনিক কাজের জন্য মজুরি পাবে ১০০ রুপি। কার্ডধারী কোন কারণে অসুস্থ্য হলে ওই পরিবারের অন্য কেউ তার কাজ করতে পারে।

রোজগার গ্যারান্টি সংক্রান্ত সকল তথ্যও তারা প্রকাশ্য স্থানে দেয়ালে একটি ছকের মাধ্যমে লিখে রাখে। দেয়ালে কার্ডধারীর নাম, কার্ড নম্বর, কাজ ও অর্থপ্রাপ্তির হিসাবসহ বিস্তারিত লেখা থাকে। এই কাজে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য থাকে একজন নারী। তিনিও জবকার্ডধারী ও অন্যান্য নারী শ্রমিকদের মত মজুরি পেয়ে থাকেন। সাধারণত বয়ঃবৃদ্ধ নারী যিনি কঠিন কাজ করতে অপারগ এমন কাউকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়।

তথ্য অধিকার আন্দোলনে রাজস্থানের সাফল্য আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। আইন অনুসারে গঠিত হয়েছে তথ্য কমিশন। এখন এই আইনের যথাযথ বাস্ত বায়নের মাধ্যমে এর সুফল মানুষের কাছে পৌছে দিতে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজস্থানের সাফল্য আমাদের জন্য উদাহারণ হতে পারে।p

হামিদুল ইসলাম হিলে-াল: নাগরিক উদ্যোগে কর্মরত

ডারবান সম্মেলন ও দলিত অধিকার আন্দোলন

২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে বর্ণ-বৈষম্য বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা ও কর্মসূচির পরিকল্পনায় জাত-পাতের বৈষম্য পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেনি। যেজন্য জাতিসংঘ ও ডারবান সম্মেলন জাত-পাতের বৈষম্য বিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। সারা পৃথিবীতে ২৬০ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৬ কোটি মানুষ আছে, যারা জাত-পাত বৈষম্যের কারণে চরম মানবাধিকার লংঘনের স্বীকার।

যদিও স্পষ্টভাবে জাত-পাতের বৈষম্যের কথা জাতিসংঘের কোন ঘোষণায় নেই। তবে, বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ে বিভিন্ন ঘোষণায় এই বৈষম্যের কথা প্রকারন্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ অনুযায়ী জাত-পাতের বৈষম্য, বর্ণবৈষম্যের মধ্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

যেহেতু ডারবান সম্মেলনে জাত-পাতের বৈষম্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি তাই, তাই গত ১৮-২৫ এপ্রিল ২০০৯ জেনেভায় জাতিসংঘ আয়োজিত ডারবান পর্যালোচনা সম্মেলন ২০০৯- এ এই বিষয়টি সুস্পষ্ট কারর জন্য 'এশিয়ান দলিত অধিকার আন্দোলন (এডিআরএম)' এবং আন্তর্জাতিক দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্কসহ অনেক সংগঠন সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালায়। এই সম্মেলনে এশিয়ান দলিত অধিকার আন্দোলন (এডিআরএম)-এর ১৮ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মালয়েশিয়া, ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ থেকে এই প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে কয়েকজন ২০০১-এ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও ভারত, নেপাল ও জাপান থেকে দলিত মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে সংশি-ষ্ট ও সরকারি প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত: বাংলাদেশের পক্ষে কোন সরকারি প্রতিনিধি ছিলেন না।

সম্মেলনে এডিআরএম বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ১৮ই এপ্রিল মূল সম্মেলনের শুরুতে জেনেভা শহরে আয়োজিত এক সমাবেশ ও র‍্যালিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ অন্যান্য দেশ থেকে আসা প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে দলিত ও জাত-পাত বিষয়টি মূল আলোচনায় উত্থাপন করার সংহতি প্রকাশ করেন।

পরের দিন ১৯ এপ্রিল সম্মেলন উপলক্ষ্যে জেনেভাস্থ সিভিল সোসাইটি আয়োজিত কর্মশালায় এডিআরএম-এর প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় দলিত সংগঠনের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং মানবাধিকার কমিশনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর জাত-পাত বৈষম্য বিষয়ে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কীভাবে চাপ সৃষ্টি করা যায়, সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একই দিনে এডিআরএম-এর উদ্যোগে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল: জাত-পাত, কাজ ও জন্মপরিচয়ের বৈষম্য সঠিকভাবে সম্মেলনে তুলে ধরার কৌশল

নিয়ে আলোচনা, সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত নীতি ও নির্দেশনা (Principles and Guidelines) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এডিআরএমসহ দলিত সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বাড়ানো, দলিত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানবাধিকার ও অন্যান্য নাগরিক সমাজের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণে মতবিনিময়; ইত্যাদি।

২০-২৪ এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত মূল সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। এই মূল সম্মেলনে দলিত প্রতিনিধিরা বক্তব্য শুনেন এবং ২১ এপ্রিল 'দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী' শিরোনামে একটি পার্শ্ব সেমিনার আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন নেপালের জাতীয় দলিত কমিশনের সভাপতি রামপাল বিশ্বকর্মা, সংখ্যালঘু বিষয়ে জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গে ম্যাকডুগাল, আধুনিক ধরনের দাসত্ব বিষয়ক জাতিসংঘের প্রাক্তন বিশেষ প্রতিনিধি অধ্যাপক ডুডু ডায়েন। এই সেমিনারে বক্তারা জোরালোভাবে জাত-পাত বৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান। উলে-খ্য, নেপালের মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি জানান, তার দেশ এব্যাপারে ইতোমধ্যেই কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ভারতের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বিচারপতি প্যাটেল বর্ণবৈষম্য বিরোধী এই সম্মেলনে জাত-পাত বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এটা ভারতের তথা দক্ষিণ এশিয়ার একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

জাত-পাত বৈষম্য সম্পর্কে একটি উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ এপ্রিল। এতে সম্মেলনে অধ্যাপক গে ম্যাকডুগাল সভাপতিত্ব করেন। মূল আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের জাকির হোসেন, ভারতের ড. বিমল থোরাড, বিজুওয়াদা উইলসন, শ্রীলংকার শিবা প্রকাশম। বিশেষজ্ঞ হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডুডু ডায়েন। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন দেশের কুটনীতিকসহ মানবাধিকার কর্মীরা অংশ নেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের কমিশনারের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়

সভায় সভাপতিত্ব করেন ররি মুগোভেন। সভা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে– বর্তমানে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় মূলত জাতীয় বিভিন্ন কমিশনের সাথে কাজ করে। এখন থেকে তারা বিভিন্ন মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও দলিত অধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার উদ্যোগ নেবে।

মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত কাজ ও জন্মপরিচয় ভিত্তিক (Work and decent) বৈষম্য নিরসনে যে নীতি ও নির্দেশনা (Principles and Guidelines) প্রকাশিত হয়েছে, সেটা কিভাবে জাতীয়ভাবে প্রচারে আনা যায়, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া।

এই সম্মেলনে জাত-পাত বৈষম্য বিরোধে দলিত অধিকার আন্দোলনে করণীয় বিষয়ে যা শিক্ষনীয় তা নিম্নরুপ–

- নেপাল, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কূটনীতিকরা মূল আলোচনায় জাত-পাত বৈষম্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন। এটা আন্দোলনের জন্য একটা বড় অর্জন। তবে ভারত তার অবস্থান পরিবর্তন করেনি।
- এই সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলে জাত-পাত বৈষম্য বিষয়ে কোন সরাসরি বক্তব্য না থাকায় এশিয়া দলিত অধিকার আন্দোলন (এডিআরএম) গণমাধ্যমে বক্তব্য দিয়ে এর নিন্দা জানায়।
- যেসব কূটনীতিকরা জাত-পাত বৈষম্য বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তারা মূলত ভারতে এই সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে বলেছেন এবং ভারত-কে এই সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানায়।
- দলিত আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সংগঠনসমূহ জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্য-কমিটির সাথে যোগাযোগ বাড়ানো প্রয়োজন।
- জাতিসংঘের বিভিন্ন ট্রিটি দলগুলোয় রাষ্ট্রসমূহ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তাই দলিত অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।
- কাজ ও জন্মপরিচয়ভিত্তিক বৈষম্য বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক যে প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে সেটাকে ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দলিত আন্দোলনকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন সেমিনার ও মূল সম্মেলনে এডিআরএম প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি নিবন্ধের লেখক এবং এ্যাডভোকেট বাবুল রবিদাস বিভিন্ন সেমিনার, কুটনীতিকদের সাথে আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। উলে-খ্য, এডিআরএম-এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) ছিল সহ-আয়োজক।

জাকির হোসেন: উপদেষ্টা, বিডিইআরএম ও প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ।

সোয়াতে শরিয়াহ আইনের নামে মৌলবাদী কর্তৃত্ব

সম্প্রতি পাকিস্তানের সোয়াত অঞ্চলে শান্তি আলোচনায় আমেরিকাসহ অনেক পশ্চিমা দেশের কূটনীতিকরা ভ্রু কোচকাচ্ছেন। কারণ সোয়াতে তালেবান কর্তৃত্বের সাথে শান্তি আলোচনায় পাকিস্তান ঐ অঞ্চলে শরিয়াহ বা ইসলামী আইন প্রবর্তনে পিছনে অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে ফিরে গেল।

সোয়াত উপত্যকা পাকিস্তানের একটি প্রশাসনিক জেলা যা এশিয়ার সুইজারল্যান্ড নামে পরিচিত। অঞ্চলটি দীর্ঘ এক দশক ধরে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা নিয়ে পাকিস্তান সরকার ও তালেবান বিদ্রোহীদের সংগামের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সাথে একইভূত হওয়ার সময় থেকে এই বিদ্রোহী দল পাকিস্তান সরকারকে টেক্কা দিয়ে আসছে। ১৯৯০ সালের দিকে ক্লেরিক মওলানা সুফী মোহাম্মদের 'তেহরিক-ই-শরিয়ত-ই-মোহাম্মদী (টিএনএসএন)' উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মালাকান্দ অঞ্চলে ইসলামী আইন বা শরিয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে অন্যতম কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়।

মাওলানা মোহাম্মদ ছিলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে পুরনো ধর্মীয় দল জামায়াত-ই-ইসলামীর একজন সক্রিয় সদস্য, যার নেতৃত্বে দলটি 'টিএনএসএম' গঠনের আগে পর্যন্ত শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৪ সালে 'টিএনএসএম' উত্তর-পশ্চিম প্রদশে একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। এই গ্রুপটি সোয়াত এবং তার আশেপাশের এলাকায় নাজিম-ই-আদল নীতি বা শরীয়াহ আদালত প্রবর্তন করতে চায়। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তান সরকার পুনরায় ঐ অঞ্চলে কিছু সংশোধনী এনে নাজিম-ই-আদল নীতি গ্রহণ করে। যদিও এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে সংগঠনটি মৌখিক প্রতিবাদ জানায় এবং আইনটি বাতিলের দাবিতে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। ২০০১ সালে 'টিএনএসএম' তালেবান শরণার্থীদের আশ্রয় এবং সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে। এমনকি সংগঠনের হাজার হাজার অনুসারী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যেজন্য মাওলানা মোহাম্মদকে পাকিস্তানের আদালত ৭ বছরের কারাদণ্ড দেয়। ২০০২ সালে 'টিএনএসএম'কে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়। এরপরও মোহাম্মদের জামাতা মাওলানা ফয়জুল-াহ্‌র নেতৃত্বে সংগঠনটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। ২০০৭ সালে সংগঠনটি সোয়াতে সেনাবাহিনী ক্যাম্প উড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান সরকারের সাথে দলটি আবারও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই বছরেরই ডিসেম্বর মাসের দিকে 'টিএনএসএম' বায়তুল-াহ মেহসুদের তেহরিক-ই-তালেবান সংগঠনের সাথে যোগ দেয়। দুইয়ের মিলিত শক্তিতে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অবস্থা তৈরী করে এবং পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র ও স্কাই রিসোর্ট হিসেবে খ্যাত সোয়াতকে যোদ্ধাদের অভয়কেন্দ্রে পরিণত করে।

২০০৮ সালের দিকে পাকিস্তান সরকার তালেবান এবং 'টিএনএসএম' এর প্রতিনিধির সাথে শান্তি চুক্তির বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করে। বলাবাহুল্য, সোয়াত উপত্যকা ও মালাকান্দ অঞ্চলে শরীয়াহ আইন প্রবর্তন তাদের ১৭টি দাবির মধ্যে অন্যতম । ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারীর নাজিম-ই-আদল নীতি বাস্তবায়নে স্বাক্ষর করেন। ফলশ্রুতিতে আবারো সোয়াত উপত্যকায় ক্ষণিক যুদ্ধ বিরতি আসে। পুনরায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশংকায় আমেরিকাসহ পশ্চিমা কূটনীতিকরা এই চুক্তির বিরোধিতা করে। বলার অপেক্ষা রাখেনা, চুক্তি স্বাক্ষরের পরও সোয়াতে শান্তি আসেনি। থেমে নেই রক্তক্ষয়। এখনো তালেবান এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই চলে প্রতিনিয়ত।

নানা মতবাদের ছত্রছায়ায় ক্ষমতার রদবদলের খেলায় প্রতিনিয়ত বলী হয় সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন-জীবিকা, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, পরিবার-পরিজন। চরমভাবে লংঘিত হয় মানবাধিকার। সোয়াত উপত্যকায় সাধারণ হিসাবে ১.৫ মিলিয়ন লোকের বাস। সেইসূত্র মতে তালেবান কর্তৃত্বের শরিয়াহ আইন প্রবর্তনের যুদ্ধে প্রকৃত পক্ষে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তার হিসাব পাওয়া ভার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এর দেওয়া এক তথ্যমতে পাকিস্তানি তালেবান যোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে ২০০৮ সালে সোয়াত এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ১২০০ লোক প্রাণ হারিয়েছে। আনুমানিক ২ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ বেসামরিক জনগণ তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে শুধুমাত্র এই সহিংসতার কারণে। তালেবানরা সরকারি কর্মকর্তাদের অপহরণ করে নির্বিচারে হত্যা করেছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পরও তালেবানরা বিভিন্ন এলাকায় ভারী অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে। স্থানীয় এক সরকারি কর্মকর্তা রশিদ খানের মতে, রকেট লাঞ্চারসহ জঙ্গিরা বিভিন্ন স্থানে তল-াশি চৌকি বসিয়েছে, মসজিদগুলো দখল করে নিয়েছে, এনজিও অফিসগুলোতে

লুটপাট করেছে এবং তাদের চলাচলের যানবাহন গুলোও নিয়ে নেয়।

তালেবানরা পুরুষদের বাধ্য করেছে দাঁড়ি রাখতে এবং গান শোনা কিংবা বিনোদনের সকল উপকরণ বিশেষত সিডি, অডিও ইত্যাদির দোকান বন্ধ করে দিতে। এমনকি তারা নারীদের, পুরুষের সঙ্গ এবং বোরকা ছাড়া বাড়ির বাহিরে না যেতে বল প্রয়োগ করছে। সোয়াতের মূল চত্বর মিনগোড়া বলে পরিচিত একটি এলাকায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে তারা বিভিন্ন আইন অমান্য করার অপরাধে ২ ডজনের বেশি মৃতদেহ লোকসম্মুখে ঝুলিয়ে রেখেছে। এসব তথ্য বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তালেবান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনে (সেনাবাহিনী আক্রমণ করলে) এলাকার সাধারণ মানুষকে তাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য করেছে। এক হিসাব থেকে জানা যায়, প্রায় ১৫০০০ এর বেশি সরকারি ট্রুপস সোয়াত উপত্যকায় বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত ছিল। তাদের হেলিকপ্টার, বন্দুক বা কামানের গোলাগুলি এবং ভারী অস্ত্রের ব্যবহার বেসামরিক লোকদের হতাহত করতো। সাধারণ জনগণ সরকারি আক্রমণের ভয়েও অনেক সময় বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায়।

অ্যামনিস্টি ইন্টারন্যাশনালের এশিয়া প্যাসিফিকের পরিচালক সাম জারিফি বলেন, পাকিস্তানি তালেবানরা গত ১৮ মাসে শিক্ষার বিরুদ্ধে বিশেষত নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে। তারা সোয়াতে ১৭০টি স্কুলের মধ্যে ১০০টির বেশি মেয়েদের স্কুল ধ্বংস করেছে। তারা প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যন্ত ৫০,০০০ জনেরও বেশি ছাত্রের পড়ালেখা নষ্ট করেছে। তারা ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়ে ধর্ম এবং জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সারা অঞ্চলে ৭০টির বেশি 'গতিসম্পন্ন এবং সহজ বিচার ব্যবস্থা' নামে কোর্ট প্রতিষ্ঠা করে। যেই বিচারে কখনো মানবাধিকার রক্ষা হতো না। নিজস্ব এফএম রেডিওর মাধ্যমে তারা তাদের এই সকল অপকর্মের বার্তা প্রচার করে। শান্তিচুক্তির পরও তালেবান কর্তৃপক্ষ তাদের লক্ষ থেকে এক চুল নড়েনি। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে– আর কতকাল কাগজে চুক্তির আড়ালে ধর্মীয় বাতাবরণে মুখ লুকাবে মানবমুক্তি! ◻

সোমা দত্ত: নাগরিক উদ্যোগে কর্মরত
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

প্রবাসী শ্রমিকরা কি বিশ্বায়িত দুনিয়ার শ্রমদাস?

'খুজিয়া দেশের ভুঁই/ও মোর বিদেশি যাদু/ কোথায় রহিলি তুই।' – পোড়ো জমি, টি এস এলিয়ট

পেটের যুদ্ধ বড় যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের শহীদেরা দলে দলে ঘরে ফিরছে। দেশে মরলে খাটিয়া পেত, বিদেশে মরায় কফিন পেয়েছে, বিমানের দোলায় চড়ে ফিরতে পেরেছে– এই যা সান্ত্বনা। এর আগেও লাঞ্ছিত বহিস্কৃত শ্রমিকদের রক্তাক্ত প্রত্যার্তন আমরা দেখেছি। এখন লাশ হওয়াও দেখতে হল। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসেছে ৪২ জনের লাশ। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে এসেছে ৬৩৫ আর গত বছর এসেছে দুই হাজার ২৩৭ জনের মৃতদেহ। এগুলো সরকারি হিসাব। হিসাবের বাইরে আরও মৃত্যু থাকা অসম্ভব নয়। ইরাক যুদ্ধের সাত বছরে নিহত হয়েছে চার হাজার ২৭৪ জন মার্কিন সেনা। তাতেই কি কাঁপন মার্কিন সমাজে! আর কি অনড় অকম্পিত আমাদের মহাশয়েরা। টনক নামের একটা বস্তু নাকি কর্তাব্যক্তিদের থাকা লাগে, এত মৃত্যু দেখে সেই জিনিসটি কি সামান্য মাত্র নড়েছে? ওই লাশগুলো তাই অনাদরে নেমেছে বিমান থেকে, অনাদরেই রওনা হয়েছে নিজ নিজ গ্রামের মেঠো পথে। বুঝলাম, জীবনের মতো সব মৃত্যুও নয় সমান।

যুগটা বাজারের। এই বাজারে সবাই সমান নয়। এখানে যার অবদান বেশি সে নয়, যে বেশি ভোগ করে সেই মর্যাদাবান-ক্ষমতাবান। খাপছাড়া শোনালেও কথাটা সত্যি। বাংলাদেশে এককভাবে প্রবাসী শ্রমিকেরাই সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে তারা সরকারিভাবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা পাঠিয়েছে, যা ওই সময়ের বিদেশি সাহায্যের তিন গুণ এবং জিডিপির ৭.৭৩ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে এ অঙ্ক প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা ছাড়ায়। বেসরকারি পথে হুন্ডি ইত্যাদি দিয়ে আসা টাকা যোগ করলে অঙ্কটা আরো বাড়ে।

কিন্তু এ তথ্য দাবিয়ে রেখে ফাটানো হয় যে গার্মেন্টস মালিকেরাই সবচেয়ে বেশি ডলার আনেন। গত বছরে গার্মেন্টস থেকে রেমিট্যান্স এসেছে সাত বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। এই টাকার অর্ধেকই আবার ওই শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বাবদ বিদেশেই ফেরত যায়। এ ছাড়া সৌখিন ভ্রমন ও বিলাসী দ্রব্য ক্রয়সহ বহু পথে ওই খাতের আরও টাকা দেশ ছাড়া হয়। তা বাদ দিলেও এ খাতে আমরা পাচ্ছি ৩.৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে প্রবাসী শ্রমিকদের থেকে এসেছে ৬.৪ বিলিয়ন ডলার। এর পুরোটা থেকে যাচ্ছে, খাটছে ও অর্থনীতির আকার বাড়াচ্ছে। অথচ গার্মেন্টস মালিকদের সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়া হয়, আয়কর মওকুফ করা হয, তাদের কারখানা পাহারা দেয় র‍্যাব, বিডিআর। কারণ তাদের আছে বিজিএমই-এর মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। আছে নিজস্ব বাহিনী, আছে এমপি মন্ত্রী, সরকার। দরিদ্র কিছু গ্রামীণ আত্মীয়-পরিজন ছাড়া প্রবাসী শ্রমিকদের আর কেহ নেই। আর্থিকমন্দা মোকাবেলায় অনেকের জন্যই সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার। অথচ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার হক সবচেয়ে বেশি গার্মেন্টসের আর প্রবাসী শ্রমিকদেরই। সদ্য ঘোষিত মন্দা মোকাবেলা প্যাকেজেও অর্থমন্ত্রী তাদের দিকে নজর দেবার সুযোগ পাননি। তাই রক্ত ঘাম-পানি করেও তাদের সেবায় বরাদ্দ কেবল কাঁচকলা।

তাদের উপার্জনে ভাগ বসায় রিক্রুটিং এজেন্সী নামের নতুন মধ্যস্বত্বভোগী। এত দিয়ে-থুয়েও চাকরি নামের সোনার হরিণের খোঁজ সবাই পায় না, তাদের স্থান হয় বিদেশের কারাগার বা শ্রমশিবিরে। এ রকম একজন প্রতারিত শ্রমিক ইখতিয়ার, মালয়েশিয়া কাজের সন্ধানে গিয়ে ফিরেছেন লাশ হয়ে। মালয়েশিয়ায় তার ঠাঁই হয়েছিল বন্দিশিবিরে,

অতঃপর নির্মম প্রহার ও পোকামাকড়ের মতো মৃত্যু। আশির দশকের শেষে মুজিব পরদেশীর 'আমি বন্দী কারাগারে...' গানটি প্রবাসীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এতেই প্রমাণ, পরবাস অনেকের কাছে কারাবাসের সমান।

তাই যার দুঃখ যন্ত্রণার শেষ নেই, তারই নাম প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক। তাদের অন্তহীন দুর্দশার গল্প কি কাউকে ব্যথিত ও লজ্জিত করে? যে শর্তযুক্ত বিদেশি সাহায্যের জন্য আমাদের অঢেল সুদ ও নানা ধরনের ক্ষতি পুষতে হয়, সেই সাহায্যকারীদের আমরা ডাকি 'দাতা' বলে। দাতাদেশগুলোর হেজিপেজিরাও এখানে রাজকীয় অভ্যর্থনা পান। অথচ বিদেশি সাহায্যের তিন গুণ বেশি দিয়েও শ্রমিকেরা পায় চাকরের ব্যবহার। এদের বেশির ভাগই সেই কৃষকদের সন্তান, যাদের কল্যাণে দেশবাসী আজও খেতে পায়। তা করতে গিয়ে এই প্রাচীন জীবটি দিনকে দিন শুকিয়ে যায়, ভিটেমাটি হারায়। যতবারই গ্রামে গেছি, দেখেছি হাড্ডিসার, সামান্য বস্ত্র গায়, খাটতে খাটতে কুঁজো হওয়া কৃষকদের। এদের সন্তানেরাই ভিটামাটি বেঁচে ভাগ্য ফেরাতে বিদেশে পাড়ি জমায়। এবং তারা তাদের পিতা-পিতামহদের মতোই প্রকৃত দাতা। তাদের পাঠানো টাকায়ই যাবতীয় আমদানী হয়ে থাকে, শোধ করা হয় তথাকথিত দাতাদের ঋণ ও এর সুদে খাতকে ঘিরে প্রায় ২০ লাখ লোকের বেসরকারি খাত গড়ে উঠেছে। গ্রামে নগদ টাকার যোগানও এরাই দেয়। তাতে কর্মসংস্থান হয়। আজকাল গ্রামে গ্রামে যে খামার, পোল্ট্রি, ফিশারি ও পাকা বাড়ি-ঘর- বাজার উঠছে, তাতেও এদেরই ষোল আনা অবদান। তাদের টাকায় পরিবারের লোকজন জোত-জমি বাড়ায়, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আসে। ব্যয়বহুল কৃষির যুগে চাষবাদের বিকাশে রেমিট্যান্সের কাঁচা টাকার অবদান বিপুল। সাধারণত তরুণেরাই বিদেশ যায় এবং এদের বেশির ভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ৩০। এদের শিক্ষার সুযোগ কম। তাই আগের চেয়ে এখন অদক্ষ যাওয়ার হার বেশি। যাওয়ার আগে বা প্রথম দফায় ফিরেই তারা বিয়ে করে। বিয়ের পর আবার চলে যায়। এদের স্ত্রীরা তাদের তরুণ স্বামীদের মতোই দুঃসহ ও নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। তার পরও রোজগেরে স্বামী তার হাতেই টাকা পাঠায় বলে পরিবারে ও গ্রামে ওই স্ত্রীরা আলাদা মর্যাদা ভোগ করে। তাদের উপর হম্বিতম্বি কমে এবং তারাও ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায় এবং পরিবারের স্বাস্থ্য নিয়ে মনোযোগী হয়। বিদেশে শ্রমবাজার সৃষ্টিতেও তাদের অবদান অসামান্য। এদের সঞ্চিত টাকায়ই গ্রামীণ সমাজে গতি আসে আর গঞ্জ হয়ে যায় ছোট শহর। তাদের কর মওকুফ হয়না, কিন্তু তাদের ডলার দিয়েই এমপি-আমলাদের জন্য বিনা শুল্কে গাড়ি আসে। আইএলওর দাবি, রেমিট্যান্সের পাঁচ শতাংশ ওইসব শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ব্যয় করতে হবে। আজকে শ্রমিকদের নিজস্ব সংস্থা থাকলে তার মাধ্যমে তারা বাজেট প্রণয়ন কিংবা সরকারি নীতি প্রণয়নের সময় চাপ প্রয়োগ করতে পারত। সেনাবাহিনীরও নিজস্ব ব্যাংক থাকতে পারলে প্রবাসীদের তা থাকবে না কেন? সেই ব্যাংকে তারা টাকা জমা রাখত, ঋণ নিত এবং তাদের সঞ্চিত টাকায় বড় বড় বিনিয়োগ ও প্রকল্পও হতে পারত। কিন্তু যে লোকটি ৫-১০ বছরের জন্য বাইরে থাকছে, যার সব সুতো ছিঁড়ে গেচে, সে কিভাবে দেশে ফিরে বড় কিছু করার চিন্তা করতে পারে? তাই বিদেশে খেয়ে না-খেয়ে জমানো টাকার সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ তাদের হয় না। কিন্তু তাদের ধনে পরের পোদ্দারি ভালোই চলে।

এখানেই গুরুতর একটি অভিযোগ তুলতে চাই। যে দেশের নাগরিকেরা বিদেশ-বিভুঁইয়ে হাজারে হাজারে অপঘাতে মরে, যাদের জীবন কেবলই 'দাসজীবনের' করুণ আখ্যান, সেই দেশ ও সেই রাষ্ট্র সার্বভৌম ও কার্যকর হয় কী করে? নাগরিকদের সঙ্গে এই শর্তেই রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক যে রাষ্ট্র সব নাগরিককেই সমান চোখে দেখবে এবং সবারই জীবনের সুরক্ষা, স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা এবং সম্পদ অর্জন ও জীবিকার নিরাপত্তা দেবে। এটাই সার্বভৌমত্বের গোড়ার কথা। প্রবাসী শ্রমিকদের বেলায় এর গুরুতর বরখেলাপ হয়েছে। প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার একটি মানবাধিকারও বটে। তাই প্রবাসে তাদের অধিকার রক্ষা না হলে অথবা নির্যাতন/অবহেলায় মৃত্যু মানবাধিকারের চরম লংঘন। রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। রাষ্ট্র তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তারা মরে যাচ্ছে অন্য দেশের মালিকের শোষণে ও পুলিশের নির্যাতনে। অর্থৎ অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তাদের জীবন নিচ্ছে, শোষণ করছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম মর্যাদার প্রতিফলন হয় তার নাগরিকদের সার্বভৌম অধিকারের মধ্য দিয়ে। অথচ এ রাষ্ট্র বিদেশে তার নাগরিকদের অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাহলে প্রশ্ন, এই রাষ্ট্র কার? কার সার্বভৌমত্বের অধিকার এখানে রক্ষিত হয়, আর কার সার্বভৌম দাবি এখানে বাতিল হয়, তার নিরিখেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। প্রবাসীদের লাশের মিছিল বলছে, রাষ্ট্র তাদের পাশে নেই। কোন দায়িত্বশীল রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এমন অমানবিক পরিণতিতে উদাসীন থাকার অর্থ সেই রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্বের চর্চা করতে ব্যর্থ। এরকম অবস্থায়ই সেই রাষ্ট্রের গরিব নাগরিকেরা বিশ্বায়িত দুনিয়ার সুলভ শ্রমদাস বনে যায়, তারা হারায় স্বাধীন মানুষের আইনি অধিকার। এই শ্রমদাসদের রক্ত-মাংস খেয়েই বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের সৌধ আরো উঁচু হয়।

কিন্তু এটা আমাদের জাতীয় লাঞ্ছনা ও জাতীয় ট্র্যাজেডি। আমরা এর বিহিত চাই। আমরা মনে করি, সব মৃত্যুই সমান যাতনার এবং সবার অশ্রুই সমান লোনা। নওগাঁর পত্নীতলার মালয়েশিয়া ফেরত ইখতিয়ারের মা-বউ এই সত্য জানেন, কিন্তু মহাশয়েরা মনে হয় জানেন না। ◻

ফারুক ওয়াসিফ: সাংবাদিক

‘টিপাইমুখ বাঁধ’ প্রকৃতি অবকাঠামো ও জন জীবনের ভয়াবহ ক্ষতি করবে

সাক্ষাৎকার

ডা. মো. আব্দুল মতিন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মতবিনিময়, র‍্যালির মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। এই টিপাইমুখ বাঁধের নানা দিক নিয়ে নাগরিক উদ্যোগ বার্তার সাথে কথা বলেছেন বাপার সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. আব্দুল মতিন

সম্প্রতি টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সারাদেশে আলোড়ন চলছে। এই সম্পর্কে কিছু বলুন

হ্যাঁ, সম্ভত এ শুধু আলোড়ন নয়। এটি বর্তমানে আতংকের পর্যায়ে রয়েছে। আমাদের চেয়েও অধিক আতংকিত ও বিক্ষুব্ধ হচ্ছে ভারতের মণিপুর, মিজোরাম ও আসাম রাজ্যের লাখ মানুষ। বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, কুমিল-া ও ময়মনসিংহের কোটি কোটি মানুষও তার অংশীদার। এমনকি বাংলাদেশের সকল স্থানের নাগরিকরাই এতে দেশের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্য বিপর্যয় নিয়ে চিন্তান্বিত। কিন্তু তারপরও গত ডিসেম্বর মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রণালয় এ বাঁধ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে, নক্সা চূড়ান্ত, প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজও শুরু হয়েছে।

মণিপুর রাজ্যের টিপাইমুখ নামক স্থানে বরাক ও টুইভাই নদীর সংযোগস্থলের কাছে টিপাইমুখ বহুমুখ বাঁধ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হবে। সিলেটের জকিগঞ্জের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর জন্মস্থল থেকে ২০০ কি.মি. উজানে নির্মিত হতে যাচ্ছে এই নদীসংহারক বৃহৎ বাঁধ। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী এর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১৬৫০ ফুট ও উচ্চতা হবে ৫০০ ফুটের কাছাকাছি। এর কাঙ্খিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগা ওয়াট, ন্যূনতম প্রাথমিক উৎপাদনমাত্রা হবে কমপক্ষে ৪ শত মেগা ওয়াট। বাঁধটি তৈরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত নর্থ ইষ্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (নিপকো) আগামী ২০১২ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবে বলে ভারতীয় সরকারকে জানিয়েছে।

আমরা জানি, ভারতীয় সরকার এই বঁধের স্বপক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরছে। সেগুলো কতটুকু যৌক্তিক?

ভারতীয় সরকারের মতে এই বাঁধ থেকে মণিপুরের স্থানীয় জনগণের সম্ভাব্য প্রাপ্তির

মধ্যে রয়েছে: বিনা খরচায় ১৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, কাছার এলাকার বন্যা প্রশমণ, মণিপুরের নৌ-পরিবহন উন্নয়ন, বাঁধ এলাকায় নগরায়ন, আসামের ফসল আবাদ বৃদ্ধি, অধিক শিল্পায়ন, মৎস সম্পদ বৃদ্ধি, অধিক মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পর্যটন সুবিধার প্রসার, উৎখাতকৃত পরিবারের জন্য স্থানান্তর, পরিবহন ও পুনর্বাসনের জন্য নগদ অর্থ ইত্যাদি। আমরা মনে করি, এই বিবেচনা পুরোপুরি যৌক্তিক নয়। কারণ খোদ ভারতীয় জনগণই এই বাঁধ নির্মাণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা জানে কথিত পরিমাণ বিদ্যুতের বদলে মণিপুরের জেলিয়া রং এলাকার মানুষ ও পরিবেশের অবধারিত ক্ষতি হবে। যেমন– বাঁধ এলাকার ২৮৮.৬০ বর্গ কি.মি. ভূমি জলমগ্ন, বরাক নদীর ঐতিহাসিক সুন্দর কিংবদন্তীর স্মৃতিভরা ঝর্ণা ও লেকসমূহ স্থায়ীভাবে জলমগ্ন, বরাক ও অন্যান্য নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস ১৭ হাজার ৩৫৪ কিউসেক, বাঁধ সংলগ্ন ১৬টি গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন, তামেংলং এলাকার আরো ৯০টি গ্রামের সকল স্থান বন্যার্ত, ১ হাজার ৩২০টি আদিবাসী পরিবারসহ ৪০ হাজার মানুষ স্থানচ্যুত, সংশি-ষ্ট এলাকার ২৭ হাজার ২৪২ হেক্টর বন ও পাহাড়ী ভূমি বিনষ্ট, বিরল বৈচিত্র্যময় জীবসম্পদ ধ্বংস, পানিবাহিত রোগ ও কলকারখানার দূষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, পানীয় জলের সংকট, অধিক সংখ্যায় বহিরাগত আগমনের ফলে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি এবং আদিবাসীদের জীবনের ঐতিহ্যগত নিজস্বতা, উৎপাদন কাঠামো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জীবন-জীবিকা তথা মৌলিক অধিকারের বিপর্যয়। কাজেই বাঁধের নির্ধারিত সম্ভাব্য সুফল প্রশ্ন সাপেক্ষ।

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশে কী প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

আমরা জানি, বরাক নদীই বাংলাদেশে প্রবেশেস্থল অমলশিদে সুরমা ও কুশিয়ারায় বিভক্ত হয়েছে যা সমগ্র সিলেট এলাকা পাড়ি দিয়ে পরবর্তীতে আবার যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে মেঘনা নদী। অর্থাৎ বরাক-সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা একই পানি প্রবাহ যা সর্বমোট ৯৪৬ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত হয়ে আছে। এর মধ্যে ভারতে রয়েছে ২৭৭ কিলোমিটার আর ৬৬৯ কিলোমিটার বাংলাদেশে। আমরা জানতে পেরেছি যে, ভারত শুধু জলবিদ্যুতের জন্য টিপাইমুখ বাঁধ বানিয়েই ক্ষান্ত হবেনা, বরাকের আরেকটু উজানে ফুলারতল এলাকায় তারা আরেকটি সেচ-ব্যারাজও নির্মাণ করবে। এসব বাঁধ নির্মিত হলে এই দীর্ঘ এলাকার পানি সরবরাহ হ্রাস পাবে, পাহাড়ী ও সমতল বন, গাছ-গাছালি, ফল-ফসল, কৃষি উৎপাদন, জলাশয়, অন্যান্য ছোট-বড় শাখা নদীসমূহ পানি বঞ্চিত হবে, বিনষ্ট হবে নৌ-পথ, শুরু হবে মরুকরণ, উপরের দিকে উঠে আসবে সামুদ্রিক লোনা পানি, জমি হবে লবণাক্ত, সৃষ্টি হবে পানীয় জলের সংকট, বিপর্যস্ত হবে বাংলাদেশের পরিবেশ ও কোটি জনতা। শুকনো মওশুমে পানি টিপাইমুখে আটকে

রাখার ফলে মোট সাতটি জেলা– সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এলাকা হবে শুষ্ক ও পানিশূন্য আর বর্ষার ভারি বর্ষণের সময় খোলে রাখা ফ্লাডগেট থেকে প্রবল স্রোতের প্রচুর পানি নেমে এসে একই এলাকা বন্যায় ভাসাবে। এক হিসেবে বলা হয়েছে যে, টিপাইমুখ বাঁধ চালু হলে বরাক দিয়ে বয়ে যাওয়া বার্ষিক ৪৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (বি.সি.এম) পানি থেকে ১৫ বি.সি.এম বা ৩১% ধরে রাখা হবে এবং সুরমা নদীর পানি বর্ষাকালেই ৫ ফুট কমে যাবে, বঙ্গোপসাগরের লবণ ঢাকা বেয়ে সিলেট শহরে পৌঁছুবে ১৫ বছরের মধ্যেই। তাছাড়াও ভূ-প্রাকৃতিক চরিত্রের কারণে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ যে ছয়টি স্থান রয়েছে তার মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই টিপাইমুখ এলাকা অন্যতম। উত্তর-পূর্ব ভারতে বিগত এক-দেড় শত বছরে সর্বমোট ১৮টি বৃহৎ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধের মত বৃহৎ অবকাঠামো এই ভূ-কম্পনকে আরো ত্বরান্বিত করবে, আর তার ধ্বংসযজ্ঞও হবে অনেক অনেক বেশী। আর বাঁধ নির্মাণের পর যে বিপুল পানি বাঁধের উজানে আটকে রাখা হবে, কোন সুনামি বা ভূমিকম্প হলে বাঁধ ভেঙ্গে সে পানির তোড় বিরাট শক্তি নিয়ে আমাদের প্রকৃতি, অবকাঠামো ও জনজীবনের ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করবে।

টিপাইমুখ থেকে আমাদের বেশ কিছু উপকার হবে বলে সম্প্রতি প্রচারণা রয়েছে, এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি ?

সম্প্রতি ভারতীয় পক্ষ ও আমাদের দেশীয় কতিপয় ব্যক্তি বলার চেষ্টা করছেন যে, টিপাইমুখ বাঁধে বর্ষকালে পানি আটকানো হবে। ফলে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যা হ্রাস পাবে আর শীতকালে তাদের বিদ্যুতের টারবাইন ঘোরানোর প্রয়োজনে ধরে রাখা পানির কিছুটা ছেড়ে দিতে হবে, ফলে শীতকালে আমাদের খরা কমবে। এটি আসলে বাঁধ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এর সাথে অন্যান্য বহু বিষয়াদি যুক্ত রয়েছে। কথাটি সত্য হলেও পূর্ণাঙ্গ বাঁধ পরিচালনা ম্যানুয়েল আমাদের দেখতে না দেয়া হলে আমরা নিশ্চিত হতে পারব না যে, কথাটি কী সঠিক না ভুল। সর্বোপরি যদি তথ্যটি সঠিকও হয়, তাও তা বাংলাদেশের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এখানে প্রকৌশলগত একটি পানির মাপজোক সামনে

> ‘ফারাক্কা’ ব্যারেজ আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী বিনষ্ট করেছে। ইতোপূর্বে ভারতীয় আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনাও ভারতের রয়েছে। উজানে ভারতের গজালডোবা বাঁধের ফলে তিস্তা শুকিয়ে যাচ্ছে।

এনে এর পরিবেশগত সমস্যাটিকে চেপে যাওয়া হচ্ছে। বর্ষাকালে অতি অতিরিক্ত পানি ও শীতকালে কিছুটা খরা আমাদের প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য যা গত হাজার হাজার বছরের চর্চার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে। এটিই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, অতিরিক্ত পানি বলে এখন কিছু নাই। বন্যা আমাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা আমাদের সমগ্র মাটি সিঞ্চনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, এতে আমাদের সারা বছরের জলজ সম্পদ যেমন মাছ, গাছপালা, ফসল ইত্যাদির পূর্বশর্ত নির্ধারণ করে। টিপাইমুখ বর্ষায় পানি হ্রাস করলে তথাকথিত বন্যা একটু কমতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রকৃতি নতুন আরেক সমস্যায় নিপতিত হবে, মাছ-ফসল-ফল-তৃণ-বৃক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর শীতকালে যে খরা হয় সেটিও আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়। খরাতেই আমাদের হাওড় ও বিল সমূহের জমিতে প্রচুর ধান চাষ হয়। অতএব টিপাই সে সময় যে অতিরিক্ত পানি দেবে তার কোন প্রয়োজন নাই, সেটি বরং এক ধরণের জলাবদ্ধতার সূত্রপাত করবে, খাদ্য নিরাপত্তাকে ব্যাহত করবে।

ফারাক্কা বাঁধের কারণে আমরা দেখেছি আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কি অবস্থা হয়েছে। উপরোন্ত ভারত ক্রমবর্ধমান হারে নতুন নতুন বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে– এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

এমনিতেই আমাদের নদ-নদীর অবস্থা ভাল নয়– দখল, দূষণ, নদীর পাড়ে দীর্ঘ অবারিত বাঁধ, ক্রস বাঁধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প, উজানে পানি প্রত্যাহার, অপরিকল্পিত বালু উত্তোলনের ফলে এক হাজার বছর পূর্বের ১৫০০ নদীর মধ্যে বর্তমানে সর্বসাকুল্যে রয়েছে মাত্র ২৩০টি। শুষ্ক মওশুমে আমাদের দেশে ৯৭% ভাগ নদীর পানির প্রবাহ ও পরিমান হ্রাস পায়। ভারত থেকে আসা ৫৪ টি নদীর উজান অঞ্চলে (ভারতীয় অংশে) ভারত সরকারের নির্মিত বাঁধ, ব্যারেজ ও বিভিন্ন প্রয়োজনে পানি প্রত্যাহারমূলক কার্যক্রমই তার অন্যতম প্রধান কারণ। ‘ফারাক্কা’ ব্যারেজ আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী বিনষ্ট করেছে। ইতোপূর্বে ভারতীয় আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনাও ভারতের রয়েছে। উজানে ভারতের গজালডোবা বাঁধের ফলে তিস্তা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তৈরী করেছি তিস্তা ব্যারেজ। ফলে তিস্তা নদী আজ বিপর্যয়ের মুখে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ী জনপদের ৭টি রাজ্যে ভারত ইতিমধ্যে ২৮টি বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ ও চালু করেছে। সিদ্ধান্ত রয়েছে মোট ১৩৮-১৪৮ টি বাঁধ নির্মাণের। তবে অন্য সূত্র মতে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বের এই বৃহৎ এলাকায় ভারত ২০৫০ সনের মধ্যে সর্বমোট এক লক্ষ মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সর্বমোট ২২৬ টি বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই এলাকার পরিবেশ, জীবন-জীবিকার বিনিময়ে তারা উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোকে ‘পাওয়ার হাউজ’ এলাকা হিসেবে ব্যবহার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টিপাইমুখ তারই অংশ। সেক্ষেত্রে নিম্ন অববাহিকার বাংলাদেশের নদী ও পানির অবস্থা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। প্রতিবেশী দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে ভারত এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন সকল প্রকার নীতি বিরোধী।

অভিন্ন নদী বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সমাধানে কোন চুক্তি বা নীতিমালা আছে কি? থাকলে সেগুলোর অনুসৃত মূলনীতি কী?

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে ভারত আন্তর্জাতিক নীতি ও কনভেনশন লংঘন করছে। এর মধ্যে রয়েছে: (ক) জাতিসংঘ জলপ্রবাহ কনভেনশন ১৯৯৭ এর পানির সমব্যবহার, অন্যের প্রতি ক্ষতি নয়, সংশি-ষ্টদের মধ্যে তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত ধারাসমূহ (খ) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার ফারাক্কা চুক্তি ১৯৯৬ এর সমতা, স্বচ্ছতা ও অন্যের ক্ষতি না করার শর্ত (গ)

বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ নীতিমালা (ঘ) বিশ্ব বাঁধ কমিশন নীতিমালা (ঙ) আন্তর্জাতিক জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ঘোষণা (চ) জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার ঘোষণা (ছ) উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা (জ) সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮। তাছাড়াও বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন প্রেক্ষাপটে কার্বন গ্যাস উৎপাদন হ্রাস ও তার ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন তথা বহুল আলোচিত অভিযোজন ব্যবস্থাপনায় কার্বন পরিষ্কারক তিনটি প্রাকৃতিক উপাদান– মাটি, পানি ও বন সংরক্ষণ ভারতসহ সকল রাষ্ট্রেরই বর্তমান অবশ্যকরণীয় বিষয়। ভারত বাংলাদেশকে সম্মত না করে কোন নদীর উপর এমন কোন অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবেনা।

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেছেন, টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে পর্যপ্ত তথ্য বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের বিরোধিতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ বিষয়ে বলুন।

বাংলাদেশ সরকার জানিয়েছে, ভারতের দেয়া তথ্য অপর্যাপ্ত। বৃহত্তম বিরোধী দল বলেছে বাংলাদেশকে দেয়া ভারতীয় তথ্য অসম্পূর্ণ। ভারতীয় হাইকমিশনার তার প্রতিবাদ করেননি। অতএব অপর্যাপ্ত বা অসম্পূর্ণ তথ্য দ্বারা আমরা সঠিক বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিতে পাচ্ছিনা। আমাদের জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ভারতে তথ্য অধিকার আইন চালু রয়েছে, বাংলাদেশেও অতি সম্প্রতি একটি আইন কার্যকর হয়েছে। অতএব উভয় দেশেরই প্রেক্ষাপটে বাঁধ বিষয়ক সকল তথ্য জানার অধিকার আমাদের রয়েছে। আর তথ্যহীনতা গুজবের সৃষ্টি করে, ধারণার সূত্রপাত ঘটায়। উভয় দেশের স্বার্থেই বাঁধের ডিজাইন, পরিচালনা পরিকল্পনা বা ম্যানুয়েল, পরিবেশগত প্রভাব প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিবেদন, পরিবেশগত সমস্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাঁধ-ভাঙ্গন প্রতিবেদন ইত্যাদি সকল তথ্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের মানুষের এ বাঁধ বিষয়ে প্রতিবাদের একটাই কারণ, মানুষ দেশ নিয়ে, তার প্রকৃতি-পরিবেশ ও অর্থনীতির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তান্বিত। অতএব আমাদের দেশ হিসেবে টিকে থাকা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই বিরোধিতার মূল কারণ। ভারতীয় হাইকমিশনারের বক্তব্যটি সঠিক নয়।

টিপাইমুখ বাঁধ বিষয়ে জনগণের যৌক্তিক দাবি আদায়ে সরকারের কী করণীয় হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আমি নিশ্চিত বাংলাদেশ সরকারও এই বাঁধের বিপক্ষে। প্রকাশ্যে সরকারের বিভিন্ন অবস্থান থেকে কিছু বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেয়া হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে ভারতের উচ্চ পর্যায়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন, কথাও ইতোমধ্যে বলেছেন। ভারতও তাকে আশ্বাস দিয়েছে, বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু তারা করবেন না। আমাদের সরকারের এখন উচিৎ হবে টিপাইমুখের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সংকটটি ভারতের নিকট শক্তভাবে উপস্থাপন করা। কিন্তু তারপূর্বে এই বাঁধ সম্পর্কিত সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা দর্শনও বাংলাদেশ সরকারকে অনুধাবন করতে হবে। আমাদের দেশে ও সমগ্র উপমহাদেশেই নদীবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীটি একটি ভুল দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরিবেশ বিবেচনায় 'বৃহৎ মানেই সুন্দর' এই স্থাপত্য ধারণাটি এখন আর সঠিক নয়। নদীর উপর যে কোন স্থাপনা যেমন: বাঁধ, ব্যারেজ, পানি প্রত্যাহার প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প এমনকি অবারিত দীর্ঘ পাড় বাঁধাইও নদীকে বিনষ্ট করে, পরিবেশ ও অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে- এক কথায় বাঁধ হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন বিরোধী, কাউন্টার প্রোডাক্টিভ। বাঁধ বর্তমানে পরিত্যাজ্য বিষয়। আর বড় বাঁধ হলে তো কথাই নাই। বাঁধের দেশ 'যুক্তরাষ্ট্রেই' ইতোমধ্যে পাঁচ শতাধিক বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল নাগরিকই এখন পরিষ্কারভাবে টিপাইমুখ বাঁধ বিরোধী, সরকারকেও পরিস্কার অবস্থান নিতে হবে ও সারা জাতির টিপাই বিরোধী অবস্থান ভারতকে জানাতে হবে। আমার ধারণা এটাই বর্তমানে সরকারের প্রধান কাজ।

সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করেও যদি ভারত এই বাঁধ নির্মাণ অব্যাহত রাখ সে ক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে বলে মনে করেন। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়তা দাবি কতটুকু যৌক্তিক?

আমার ধারণা ভারত তা করবে না। করলে তা হবে বাংলাদেশ ও সমগ্র অঞ্চলের জন্য ভয়াবহ ও বিপর্যয়কর। এ কাজ বন্ধ করতে অনেক কিছু ভাবা প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র জনগণের সচেতন ও সংগঠিত প্রতিবাদই যথেষ্ট হবে। কারণ ভারত নিশ্চিতভাবেই জানে তিন দিকে ভারত বেষ্টিত বাংলাদেশের যেকোন অস্থিরতা তার জন্যও নিরাপদ নয়। টিপাইমুখ সৃষ্ট সম্ভাব্য সংকটের ফলে আর্থিক বিপর্যয়গ্রস্থ লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী জনতা বাঁচার তাগিদেই ভারতমুখী হবে, যেমনটি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় !

পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রপথিক হিসেবে বাপা বিষয়টিকে নিয়ে কী ভূমিকা রাখছে?

বাপা'র প্রধান কাজই হচ্ছে পরিবেশ সংকট বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা, সরকারকে সচেতন ও সচল করা। টিপাইমুখের বেলায়ও সভা-সমাবেশ, আলোচনা, সংবাদ সম্মেলন, সংবাদ মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বক্তব্য, সংবাদপত্রে লেখালেখি, জনতার সম্মেলন, জাতীয় ও আঞ্চলিক নদী রক্ষা আন্দোলন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিং ইত্যাদি সবকিছুই বাপা'র কৌশলে রয়েছে। এটি বাপা'র অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সোমা দত্ত

জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর উপর প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে মানব সভ্যতা ও নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যা হলেও মানবিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থার উপর এর ক্ষতিকর স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রভাব রয়েছে। সেই কারণে জলবায়ু পরিবর্তনকে শুধু একটি পরিবেশগত উদ্বেগ নয় বরং এটাকে আগামী বিশ্বের জন্য বড় সংকট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যাটি মূলত ধনী ও শিল্পোন্নত দেশের সৃষ্টি। দরিদ্র ও প্রান্তিক সম্প্রদায় বিশেষ করে এইসব সম্প্রদায়ে বসবাসরত নারীরাই এর ক্ষতিকর পরিস্থিতির ভয়াবহ শিকার। নারীরা বিশ্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭০ শতাংশ। পুরুষদের তুলনায় তাদের আর্থিক সম্পদ, জমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ কম। সে কারণে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে কম সমর্থ হয়। আমাদের দেশের নারীরা এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশ নাজুক। তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত পরিস্থিতি এবং বিপদ যেমন– তাপমাত্রা বৃদ্ধি, নদী ভাঙ্গন, খরা, ভয়াবহ বন্যা, সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস, বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন, ইত্যাদি মোকাবেলায় দক্ষতার অভাব রয়েছে।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির তালিকায় অন্যতম একটি স্থান দখল করে নিয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের বেশি জনসংখ্যা চরম দরিদ্র এবং তাদের মধ্যে এক চতুর্থাংশের অবস্থা আরও খারাপ। তারা খাদ্য আশ্রয়, স্বাস্থ্য, মৌলিক সেবা এবং নিরাপত্তার অভাবের মধ্যে বাস করে। এদের মধ্যে নারীদের অবস্থা আরো তীব্রতর। তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সামাজিক ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত। প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগে তাদের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন তাদের জন্য ভোগান্তি বয়ে আনছে এবং সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতেও এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে। যা মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশের নারী

আমাদের দেশে অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নারী। তারা গৃহস্থালীসহ অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদন করলেও দুর্ভাগ্যবশত তাদের কাজ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায় না। অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব এবং প্রতিনিয়ত বঞ্চনার কারণে নারীরা সামাজিকভাবে ক্ষমতার অনেক পিছনে পড়ে থাকে। অধিকাংশ নারীরই সঠিক শিক্ষা, কাজের সুযোগ এবং উৎপাদনশীল সম্পদে প্রবেশাধিকার নেই। আর এ কারণগুলোই নারীদের অর্থোপার্জন, স্বায়ত্বশাসন এবং মৌলিক চাহিদা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সমাজ এবং পরিবারের অভ্যন্তরে বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নারীদের প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়। তারা নিজেদের অধিকার নিয়ে দরকষাকষিতে ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। আর এই ধরনের অসহায় অবস্থাই পুরুষশাষিত সমাজে নারীদের পণ্যে পরিণত করে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী এখনো তাদের এই দুর্বল অবস্থান বিষয়ে অতটা সচেতন নয়। তারা বেশির ভাগ সময় তাদের দুর্দশার জন্য নিজেদের দায়ী মনে করেন এবং লজ্জায় মুখ ঢাকেন। নারীদের সুশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকাকে আরো অর্থবহ করা যায়। তাদের অবশ্যই সেইসব সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, যা শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে সাহায্য করবে। উপরোক্ত নারীরা প্রকৃতিগতভাবেই প্রকৃতি এবং পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল। পরিবেশ রক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা আদিম এবং ঐতিহ্যগত। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নারীরাই হতে পারে পরিবেশ রক্ষার মূল শক্তি।

জলবায়ু পরিবর্তনে নারীর উপর প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ও দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ বাংলাদেশে নারী ও পুরুষ উভয়েরই স্বতন্ত্র ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। কারণ তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজিত শ্রমে নিয়োজিত। জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। কাজেই এই পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় কী কী ঝুঁকি, সুযোগ এবং করণীয় আছে তা নারী-পুরুষ ভেদে পুনসুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। জলবায়ু

পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার অভিযোজন সংক্রান্ত গবেষণায়ও নারীর গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়। ঝুঁকি প্রবণতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পার্থক্যের দিকে খুব কমই নজর দেওয়া হয়। উন্নয়ন উদ্যোক্তাদের গবেষণা থেকে জানা যায়– গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা খুব কমই মতামত ব্যক্ত করতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের অনুপস্থিতিতেও নারীর স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা কম থাকে। তারা গৃহস্থালী কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বহির্জগত থেকে দূরে থাকে। বিচরণের সর্বক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান আমাদের দেশের নারীদের দরিদ্র্যের মধ্যেও দরিদ্র করছে। তাছাড়া তাদের শারীরিক গঠন, তাদের প্রচলিত পোষাক যেমন: শাড়ি, লম্বা চুল জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে বিধায় তারা অধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। অন্যদিকে সংসারে দৈনন্দিন ব্যবহাবের জিনিসপত্রের প্রতি মমতা, পরিবারের বৃদ্ধ এবং শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব-কর্তব্য দুর্যোগের সময় তাদের পিছনে টেনে ধরে। খুব নীরবেই প্রকৃতির ভয়াল আক্রোশের শিকার হয় নারী।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে জেন্ডার বিবেচনা উপেক্ষিত হওয়ায় মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নতিকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাইরের সহায়তা ও প্রচেষ্টা বেশিরভাগ সময় ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের দরিদ্র নারীরা তাদের জীবন-জীবিকা, সম্পদ (যতখানিই নিজের বলে ভাবে), পরিবারকে আবহাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। উষ্ণ আবহাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য দুর্যোগ তাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা আরো বাড়িয়ে দেয়। ফসলী জমির পরিমাণ এবং সম্পদ কমে যাওয়ায় মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়ির বাইরের কাজে যুক্ত হওয়ার চাপ বাড়ছে।

খরার সময় সংসারের গতানুগতিক দায়িত্বের বাইরেও তাদের দূর-দূরান্ত থেকে খাবার পানি সংগ্রহ, পানি শুদ্ধকরণ ইত্যাদি কাজে অধিক সময় ব্যস্ত থাকতে হয়।

নারী এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি সম্পৃক্ত রোগ-ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি নারীর কাজের বোঝা বাড়িয়ে তুলছে। কারণ নারীরা সেবা প্রদানমূলক কাজে অধিক যুক্ত থাকায় তাদেরকে আরো বেশী সেবা ও সময় দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে নিজেরাও বার বার নানা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পড়ছে। এক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার মত মশা বাহিত রোগের কথা উলে-খ করা যায়। এই রোগটি জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষত তাপমাত্রা এবং অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বেশি হয়। ম্যালেরিয়ায় গর্ভবতী নারী বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকে। কারণ ম্যালেরিয়া বাহিত মশা অন্যদের তুলনায় তাদের দ্বিগুন কামড়ায়। অন্যদিকে গর্ভাবতী নারীদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়, সে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ে, এমনকি মারাত্মক রক্তশূণ্যতায় তার মৃত্যুও হতে পারে। উপরোক্ত গর্ভকালীন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত নারীদের গর্ভপাতের ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকে এবং তারা অপরিণত প্রসব, মৃত ও স্বল্প ওজনের শিশু জন্ম দেয়- যা শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেকোন দুর্যোগ নারীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর আঘাত হানে। পুরুষরা বাহিরের কাজে যুক্ত থাকায় তারা এই সময় পর্যাপ্ত সহযোগিতা পায়না।

নারী এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা

নিরাপত্তা সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষত পরিবারে নারীর তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকার জন্য আরো বেশি। এমনিতেই আমাদের দেশের নারীরা দারিদ্রের মধ্যে অবস্থান করে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে থাকে। উপরোক্ত গ্রামের নারীরা বা নদী তীরে বসবাসকারী নারীদের অবস্থান আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর তাদের স্বাস্থ্যগত বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। তারা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। এটি নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত জটিলতা তৈরী করে। আবার দুর্যোগের সময় ও কিছুপর পর্যন্ত পরিবারের- বিশেষত পুরুষদের আয় কম হয় বা বন্ধ থাকে। তারা স্থায়ী কোন চাষ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারেনা। কিন্তু সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব নারীকেই নিতে হয়। কখনো আধ-পেটা কখনো স্বামী-সন্তানকে খাইয়ে নিজের অনাহারে দিন কাটায়। মানসিক এবং শারিরীক অবসাদ ও অস্থিরতায় পারিবারিক কলহ বাড়ে। কোন কোন পুরুষ বাড়ি থেকে দূরে কাজের সন্ধানে গিয়ে পুনরায় নতুন বউ এনে হয়ত খুঁজে পায় নতুন আশ্রয়। পেছনে নারীর জীবনে পড়ে থাকে শুধুই হতাশা!

বলাবাহুল্য, নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের সক্রিয় শিকার। যদিও আমরা দেখি যে, নারী আবহাওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলতে, বিপদ থেকে তাদের জান-মাল নিরাপদে রাখতে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করে। তবে অনেক সময় তারা হয়ত মানিয়ে চলার সম্ভাব্য সকল ইতিবাচক উপায় সম্পর্কে সচেতন থাকেনা। কিছু একটা উপায় ভেবে তারা সংকট কাটাবার চেষ্টা চালায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- অনেক নারী মনে করে শষ্য বহুমুখীকরণ এবং উপযোগী কৃষির

প্রচলন একটি প্রয়োজনীয় দিক। যদিও তারা এটা ভাবেন, কিন্তু নতুন কৃষি পদ্ধতি ব্যবহারে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অভাব আছে। তথাপি তারা তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তি বা এনজিও প্রতিষ্ঠানের থেকে জানতে চাইতে পারে কীভাবে বন্যা খরা সহনশীল কৃষি বা পশু-পাখি পালন করা যায়, বিশেষ ধরনের জলবায়ুগত অবস্থার সাথে উপযোগী বিভিন্ন রকমের ফসল (স্থানীয় এবং হাইব্রিড) রয়েছে। দুর্যোগ প্রবণ এলাকার নারীদের সচেতন ও দক্ষ করতে জমিতে যথাযথ সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, চাষের সঠিক পদ্ধতি, চাষ পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তি এবং উন্নত পশু পালন পদ্ধতি, অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় পাঁকা অথবা শক্ত কাঠামোর বাড়ি তৈরী প্রভৃতি বিষয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। একই সাথে দরিদ্র্য নারীদের জীবনযাত্রা উন্নত করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দিকটিও গুরুত্ব দিতে হবে।

আশার কথা, বর্তমানে দরিদ্র এবং নারীর উপর জলবায়ু পরিবর্তনের অসম প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে, যাতে তারা দুর্যোগকালীন তাদের জীবন সম্পদ, খাদ্য ও পুষ্টি, দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারে। আইপিপিসির লেখক এবং জলবায়ু বিজ্ঞানীরা নারীর উপর দুর্যোগকালীন ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনে দরিদ্র এবং নারীদের ঝুঁকি কমাতে আমাদের দ্রুত কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া অবশ্যই জলবায়ু, নারী এবং উন্নয়নের সাথে আন্তঃযোগাযোগের ভিত্তিতে করতে হবে, যাতে করে গৃহীত নীতি, কর্মসূচি নারী এবং জলবায়ু সহায়ক হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নারীর জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে হবে। এজন্য আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক প্রস্তুতি দরকার। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নারী বিশেষত, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং নাগরিক সমাজ একত্রে কাজ করতে পারে। ◻

নাজরিয়া ইসলাম এবং দ্বিজেন মলি-ক: গবেষক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্ট্যাডিজ (বিসিএএস)।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮: বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ

আওয়ামী লীগ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার ঘোষিত বাজেট বক্তৃতায় ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহালের কথা বলেছেন। কিন্তু যেহেতু এখন পর্যন্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়নি তাই তাদের প্রণীত বাজেট কতটুকু নারীবান্ধব তা নির্ণয়ে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮' সামনে রেখেই আলোচনা এগিয়ে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, সমাজে বিদ্যামান জেন্ডার

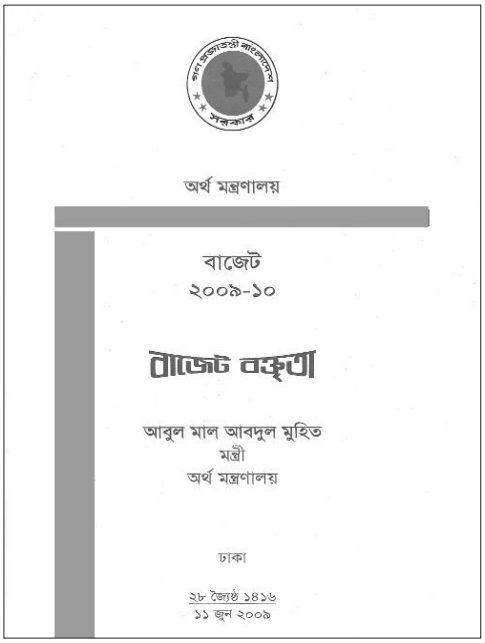
অর্থ মন্ত্রণালয়

বাজেট
২০০৯-১০

বাজেট বক্তৃতা

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

ঢাকা

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
১১ জুন ২০০৯

অসমতার বিষয়গুলো উলে-খ করে সে অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া না হলে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনা সম্ভব নয়।

'নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮

নারী উন্নয়ন নীতিমালায় ৫টি অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায়ে নারীর অবস্থান, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী ও নারীর মানবাধিকার, মানব সম্পদ হিসেবে নারী, নারী ও রাজনীতি, প্রশাসনে নারী, নারীর সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা। ২য় অধ্যায়ে আছে: নারী উন্নয়ন ও সমতা নিশ্চিতকরণে ১৯টি লক্ষ্য। ৩য় অধ্যায়ে আছে: মানবাধিকার- নারীর মৌলিক অধিকার, সিডো বাস্তবায়ন, অন্যান্য বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন নারী নির্যাতন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য পুষ্টিসহ সকল কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ; নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, নারী ও পরিবেশ, গৃহায়ণ, আশ্রয়, গণমাধ্যমে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি। ৪র্থ অধ্যায়ে আছে নারী নীতি বাস্তবায়ন কৌশল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ NCDW সংসদীয় কমিটি, WID focal point-এর ভূমিকা নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি (তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়), সরকারি-বেসরকারি এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা। নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। শেষ ও ৫ম অধ্যায়ে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।

২০০৮ সালের ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালায় আরো যে সেকল বিষয় লক্ষণীয় তা হলো– ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতির প্রতিফলন, বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন, নারীর নিরাপত্তা ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, নারীকে Cross cutting issue হিসেবে বিবেচনা, অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, জাতীয় সংসদে ১/৩ আসন সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান, সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ব্যবসায়ে সমান সুযোগ ও সমানাধিকার, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, উচ্চ প্রশাসনিক পদে নারীর নিয়োগ, চাকুরিতে নারী কোট বৃদ্ধি এবং মাতৃত্বজনিত ছুটি বর্ধিত করে ৫ মাস বাড়ানো ইত্যাদি।

'জাতীয় বাজেট ২০০৯-২০১০' এ নারী উন্নয়ন নীতিমালার প্রতিফলন কতটুকু?

মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটকে জেন্ডার 'সংবেদনশীল বাজেট (Gender Responsive

Budget)' শিরোনামে অভিহিত করেছেন। তিনি এই বাজেটে শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৃথক বরাদ্দ রেখেছেন। এই চারটি মন্ত্রণালয়ের সর্বোচচ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি প্রকল্পের পাশাপাশি নারী উন্নয়ন বান্ধব ১০টি প্রকল্পের আলাদাভাবে বরাদ্দ উলে-খ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশীদারিত্ব কতটুকু, তারা সরকারি কার্যক্রম থেকে কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন এবং জাতীয় সম্পদে নারীর হিস্যা নিশ্চিত করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ (affirmative action) গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এ **নারী শিক্ষার** উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ– 'নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূরীকরণ, আগামী দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর, নারীর জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও শক্তিশালীকরণ, পাঠ্যক্রমে নারী-পুরুষ সমতা প্রেক্ষিত সংযোজন, শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়ে শিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা, কারিগরী প্রযুক্তিগত ও উচ্চশিক্ষাসহ সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি'; ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে। এবারের বাজেটে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি নারী উন্নয়ন বান্ধব প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, ইডেন মহিলা কলেজে এক হাজার আসনের ছাত্রাবাস তৈরী, ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অব দি ডিপার্টমেন্ট অব উইমেন্স স্ট্যাডিজ অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, লাইফ স্কিল বেইজড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এডুকেশন ফর ইন স্কুল ইয়ুথ এন্ড অ্যাডলোসেন্টস থ্রু পিয়ার অ্যাপ্রোচ ইত্যাদি। এসব প্রকল্পে বরাদ্দের ৬৭.৬ শতাংশ নারীর কল্যাণে ব্যয় করা হবে (দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জুন '০৯)। এছাড়াও নারীদের শিক্ষার উন্নয়নে আরো কতকগুলো নতুন পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, যেমন– পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্রী উপবৃত্তি অব্যহত রাখা, সেশনজট কমানো, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষায় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার, প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো, প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নারীর জন্য সহায়ক করা; ইত্যাদি বলা হয়েছে। এবারের বাজেটে এর কিছু দিক গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন– স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মোট বরাদ্দের ৬৩ দশমিক ৭ শতাংশ অর্থাৎ ৪ হাজার ৪৫৯ কোটি ৪৭ লাখ টাকা, এডিপি বরাদ্দের ৪৮ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং ১০টি নারী বান্ধব প্রকল্পের ১ হাজার ৪৭৪ কোটি ৭৪ লাখ টাকা নারীদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০০৯)। মাতৃমৃত্যু রোধসহ মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র ও নিঃস্ব গর্ভবতী নারীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচিকে আরো ৪৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ২.৯ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনা হবে। মেটারনাল হেলথ ভাউচার স্কীম এবং ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রামের জন্য যথাক্রমে ৭০ কোটি টাকা এবং ১৭৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ু ৭০-এর কোটায় উন্নীত হবে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ হার ৮০ শতাংশে উন্নত করা এবং এ পদক্ষেপ হিসেবে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে ৪৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৬ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি হিসেবে মোট ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, সুষম খাদ্যাভাস, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পুষ্টি যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে প্রচারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এছাড়াও দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকাল ভাতা মাসিক ৩৫০ টাকায় নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা একটি নতুন সংযোজন। এই কর্মসূচিতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি নারী উন্নয়ন নীতিমালার বিশেষ গুরুত্ববপূর্ণ দিক। সেই দিক থেকে এবার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের মোট বরাদ্দ ২৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকার ২১ দশমিক ৪ শতাংশ নারীর উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ৪৯ দশমিক ৭ শতাংশ নারীর উন্নয়নে ব্যয় হবে বলে ধরা হয়েছে এই বাজেটে। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং উন্নয়ন বাজেটের ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ নারী কল্যাণে ব্যয় হবে। ১০টি নারী উন্নয়ন বান্ধব প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯২ দশমিক ৫ শতাংশ। কৃষি ও বিদ্যুত খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। পল-ী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে উলে-খযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ঋণ প্রদানে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ এবং মাঝারি শিল্পে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ ঋণ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখা হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদের হার হবে ১০ শতাংশ। নারীদের আত্মকর্মসংস্থানে ১০ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ হবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্যের হার ১৫ শতাংশ নামিয়ে আনা হবে। বয়স্ক ভাতার আওতা বাড়িয়ে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার করা হবে। এখাতে ৮১০ কোটি টাকা বরাদ্দ। দুঃস্থ মহিলা ভাতার হার ৩০০ টাকা হতে ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ হবে। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসিডদগ্ধ নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিলে ২ কোটি টাকা। এছাড়াও ৬টি নাসিং ইনস্টিটিউটকে নাসিং কলেজে রূপান্তর এবং নতুন করে আরো ১২টি নাসিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এ **নারীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে** সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। এবারের বাজেটে তার অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে। বাজেটে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদের মহিলা আসন সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত করা হবে। এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে যোগ্য নারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ, এসিড সন্ত্রাস, নারী ও শিশু পাচার এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা দেওয়া, নারী শিক্ষা প্রসারে পদ্ধতিগত সুযোগসহ কর্মক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তা, মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার বাড়ানো হবে। কর্মজীবী নারীর জন্য বিভিন্ন জেলা সদরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ করা হবে; ইত্যাদি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, এবারের বাজেটে বরাদ্দ এবং দৃষ্টিভঙ্গি দুটোই ইতিবাচকভাবে

> জাতীয় সংসদের মহিলা আসন সংখ্যা ১০০ তে উন্নীত করা হবে। এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কিছু কিছু খাত, যেমন– ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, নারীর প্রযুক্তিগত বিকাশ, নারীবান্ধব পরিবেশ, দরিদ্র ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর জন্য গৃহায়ণ ও আশ্রয়, গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও সক্রিয় অংশগ্রহণ, স্থানীয় সরকার সদস্য, সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি; ইত্যাদি নিশ্চিত করতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাবনা বা বিশেষ বরাদ্দ নেই। এমন কি এই বাজেটের অন্যতম একটি সমালোচনা ছিল নারী উন্নয়ন নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে এই বিষয়ে কোন প্রস্তাবনা এবং বরাদ্দ না রাখা। কাজেই নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাজেটে শুধু নারীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থই নয়, অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয়েও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং যথাযথ মনিটরিং জরুরি। ◻

সোমা দত্ত: নাগরিক উদ্যোগে কর্মরত।

ব ই প র্যা লো চ না

‘ক্রসফায়ার’ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড

ক্রসফায়ারে নিহত ঝিনাইদহের আব্দুল মজিদের ছেলে হারুন অর রশিদ বাবার মৃত্যুর আগে কালিগঞ্জ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতো। বাবার মৃত্যুর পর বাজারে গ্যারেজে কাজ করে। ওয়েল্ডিং-এর কাজ শিখছে। গ্যারেজের মালিক দুই বেলা খারার দেয় এবং মাসে দুই থেকে তিনশ টাকা দেয়। পড়াশুনা বন্ধ করলে কেন জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় ‘টাকা পাব কোথায়? আগে আব্বু জন বেঁচে (দিনমজুরি করে) সংসার চালাতো। আমাকে পড়াত। এখন মা সংসার চালাবে না আমাকে পড়াবে?’ ঐতিহ্য এবং চিন্তার যৌথ প্রকাশনা নেসার আহমেদ সম্পাদিত µmdvqv: ivóª iv‡R%bwZK nZ¨vKvÊ বইয়ে এভাবেই একজন নিহতের সন্তানের কথা উঠে এসেছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে প্রকাশিত বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে সিরাজ সিকদার, মনিরুজ্জামান তারা, মোফাখখার চৌধুরী, কামরুল মাস্টার, ডা. মিজানুর রহমান টুটু সম্পাদকের ভাষায় যারা নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন। ভূমিকা লিখেছেন ফরহাদ মজহার।

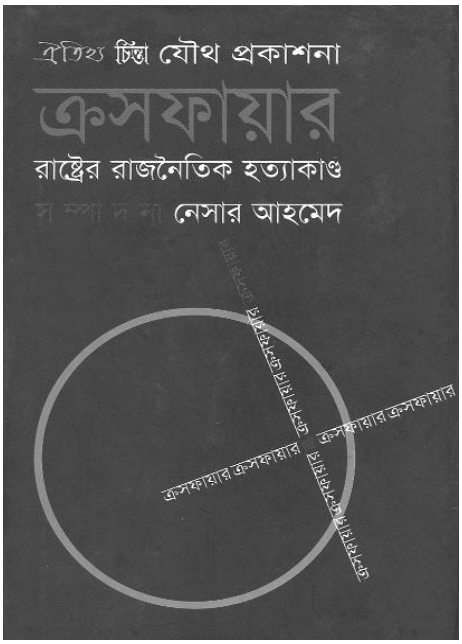

বইটি মূলত দেশে র‍্যাব, ডিবি, পুলিশ এমনকি বাংলাভাইয়ের হাতে নিহতদের পরিবার পরিজন এবং নিকট আত্মীয়ের সাক্ষাৎকারের সমন্বয়। যারা র‍্যাবের হাত থেকে গ্রেফতার হয়ে ক্রসফায়ার থেকে রক্ষা পেয়েছেন, স্থানীয় নেতা কর্মী যারা ক্রসফায়ার নিয়ে ভাবছে এবং জাতীয় পত্রিকার জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। বইটির সম্পাদক নেসার আহমেদ অত্যন্ত নিখুঁতভাবেই সাক্ষাৎকারগুলো গ্রহণ করেছেন এবং হুবুহু তাদের ভাষাতেই ছাপিয়েছেন। যা কালের সাক্ষী হিসেবে থাকবে। এসকল সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি ক্রসফায়ারে নিহত পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির (এমএল, লাল পতাকা) নেতা ডা. মিজানুর রহমান টুটুর (রাকেশ কামাল) রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এবং পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির (সিসি) এর প্রতিনিধি আলমগির হোসেন এবং পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) প্রতিনিধি তুষারের বক্তব্য বইটিকে বাংলাদেশে তথাকথিত নিষিদ্ধ পার্টি সম্পর্কে জানার একটা পথ তৈরি করে দিয়েছে। এছাড়া মোফাখখার চৌধুরী এবং ডা. মিজানুর রহমান টুটুর মৃত্যুর পর পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল, লাল পতাকা) বিবৃতি ছাপানো হয়েছে। বইয়ের শেষভাগে তিনটি সংযোজনী রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফরহাদ মজহারের ২টি প্রবন্ধ; র‍্যাব গঠনের গেজেট এবং বিভিন্ন জেলায় নিহত রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থকদের নামের তালিকা।

দেখা যাচ্ছে ক্রসফায়ারে নিহত অধিকাংশই একটা ‘বিশেষ ধারার’ রাজনৈতিক কর্মী। সংবাদপত্র-র‍্যাব-পুলিশের কর্মকর্তাদের ভাষ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত-বেআইনি, উগ্রপন্থী বা চরমপন্থী দলের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দলগুলো হলো: পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল, জন যুদ্ধ), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল, লাল পতাকা), পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (সিসি), পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি (এমবিআরএম), বাংলাদেশের বিপ-বী কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, নিউ বিপ-বী কমিউনিস্ট পার্টি এবং জাসদ

গণবাহিনীর প্রাক্তন কিছু সদস্য। অবশ্য আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি কিংবা বিএনপির কিছু সদস্য ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে, যাদের তথাকথিত নিষিদ্ধ ঘোষিত দলের সাথে 'গোপনে' সম্পৃক্ততা রয়েছে।

নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী মেন্যুফেস্টোতে পরিষ্কারভাবে বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধে ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীবৃন্দও ক্রসফায়ারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করেছেন। তারপরও বিগত ৬ মাসে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিনা বিচারে ৩৮টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যাদের ব্যাপারে কোন আইনি পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। গত ১২ মে ২০০৯ বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দ্বিতীয় বারের মত আগামী ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি দেশেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হঠিত হয়েছে কিন্তু মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি কতটা হয়েছে তা দেখার বিষয়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ১৮ মে বাংলাদেশ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ইউপিআর অধিবেশনে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বিচার বহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' অবস্থানের ঘোষণা দেন। কিন্তু দুঃখজনক হলো মন্ত্রী মহোদয়ের এই বক্তৃতার ৩ ঘন্টার মধ্যে ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশের হাতে সামসুল ইসলাম রবিন নিহত হন। দেখা যাচ্ছে ৩১৫ জন ২০০৬, ১৮৪ জন ২০০৭ এবং ১৪৯ জন ২০০৮ সালে ক্রয়ফায়ারে নিহত হয়েছেন। আর তৎকালীন বিএনপি সরকার র‍্যাব গঠন করে সন্ত্রাস দমনের নামে বিনা বিচারে হত্যার পথ তৈরি করেছে। এসময় দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ সরকারের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছিল।

পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল (পিআরবি) অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ সদর দফতরের পূর্বানুমতি ছাড়া এই সংস্থার সদস্যরা গুলি চালাতে পারবে না। তবে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বা যাবতজীবন সাজাপ্রাপ্ত কোন আসামী পালানোর চেষ্টা করলে, দাঙ্গা দমনকালে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেলে এবং কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্তব্যরত পুলিশের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে গুলি চালাতে পারবে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে

> ক্রসফায়ার সমাজ, রাষ্ট্র, বিনিয়োগ ও চেতনার একটা অসুস্থ লক্ষণ। জনতার পিটুনিতে ছিনতাইকারী নিহত আর র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী মারা গিয়েছে'- এ দুটো ঘটনা আমাদের সকলের অসুস্থতা বলেই সনাক্ত করি। আমাদের চিকিৎসা হওয়া দরকার।

ক্রসফায়ার মূলত 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত' হওয়ার কারণে সংগঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ- ৩১, ৩২), আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ (৩ এবং ১১ ধারা) এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিনা বিচারে নিরাপত্তা কর্মীদের 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত' হওয়ার নামে মারা যেতে পারেনা। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার (Natural Justice) এর নীতির একটি হচ্ছে Audi alteram partem বা let the other side be heard অর্থাৎ কারো বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে অবশ্যই তাকে শুনতে হবে। কোন ব্যক্তির বিচার পাওয়ার অধিকার তার মানবাধিকার। ক্রসফায়ারের নামে হত্যা নিঃসন্দেহে মানবাধিকার তথা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের লংঘন।

গৃহীত সাক্ষাৎকারে ক্রসফায়ারের বদলে সকলেই বিচারের কথা বলেছেন। খুলনা জেলায় ক্রসফায়ারে নিহত আল আমিনের ভাই সুমনের মতে- 'আমি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘোর বিরোধী। কারণ প্রত্যেকটা অন্যায়েরই শাস্তি আছে। অন্যায় কি অন্যায় নয়, তা দেখার জন্য আদালত আছে। আদালত রায় দেবে এই অন্যায়ের জন্য কী শাস্তি হওয়া উচিত। সেটা না করে বিনা বিচারে মানুষ মেরে ফেলে দেয়া তো সরকারের দিক থেকে আইন ভঙ্গ করা। তাছাড়া, ক্রসফায়ারে যাদের হত্যা করা হয়েছে ও হচ্ছে তাদের অধিকাংশই চিন্তাশীল চিহ্নিত রাজনৈতিক দলের কর্মী। রাজনৈতিক কর্মীদেরকে এভাবে হত্যা করা যায় কিনা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। এটা রাষ্ট্রের দিক থেকে বেআইনি কাজ। এর অবশ্যই প্রতিকার হওয়া উচিত।' রাজশাহীর ক্রসফায়ারে নিহত আহসান হাবিবের বাবা আফসার আলী মোল-ার মতে 'এটা (ক্রসফায়ার) সম্পূর্ন অবৈধ, অন্যায়। এর থেকে বড় অপরাধ আর হতে পারে না। একজন মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করা এটা জঘন্যতম অন্যায়। এর প্রতিকার হওয়া উচিত এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ এটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। মানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের হত্যা করছে।'

জোনাথন সুইফট তাঁর *গালিভার ট্রাভেলস্* এ লিলিপুটদের দেশে বিশাল দৈত্য আর ঐ গালিভারই আরেক দেশ ব্রবডিংনাগ-এ তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাণী যাকে ঐ দেশের মানুষ freak of nature বলেছে। তাই আজকে এই তথাকথিত সভ্য সরকারি বাহিনী বিনা বিচারে যেভাবে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করছে, কে জানে আগামী দিনে হয়ত এই হত্যার জন্য একদিন আমাদের সকলকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে ক্রসফায়ারকে নীরবে মেনে নেওয়ার অপরাধে। যেমনটি গ্রীসের দাসদের অবর্ণনীয় অত্যাচার গ্রীকবাসীদের কাছে সেই সময় সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজকের চোখে তা বিরাট অপরাধ। ক্রসফায়ারে নিহতদের সম্পর্কে ফরহাদ মজহারের ভাষায় 'সমাজের সম্পদশালী, ছোট বড় পুঁজির মালিক এবং সচ্ছল চাকুরীজীবীদের পাশাপাশি যদি গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষও ভাবতে শুরু করে সন্ত্রাস নিছকই একটা অপরাধ, 'সন্ত্রাসী' হওয়া না হওয়ার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক নীতির কোন যোগ নেই, তখন ফ্যাসিবাদ একটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে সমাজে শেকড় গেড়ে বসে। সমাজে এ ধরনের চিন্তা যখন প্রবল ও প্রকট হয়ে ওঠে তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের যোগ থাকে। র‍্যাব আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, বিনিয়োগ ও চেতনার একটা অসুস্থ লক্ষণ। জনতার পিটুনিতে ছিনতাইকারী নিহত আর র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী মারা গিয়েছে'- এ দুটো ঘটনাকে আমি একই সূত্রে আমাদের সকলের অসুস্থতা বলেই সনাক্ত করি। আমাদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। ◻

মাজহারুল ইসলাম: সমাজ কর্মী

জানার অধিকার ও তার চর্চা
বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তব প্রয়োগের ভেতর দিয়ে কীভাবে সাধারণ জনগণ রাষ্ট্র প্রক্রিয়ায় তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারে এবং রাষ্ট্র আরো গণমুখী হয়ে উঠতে পারে তাই তুলে ধরেছে 'আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার' বইটি।

কমনওলেথভুক্ত বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে দেশগুলোর জনগণ নিজেদের ক্ষমতায়নে যেভাবে উদ্যোগী

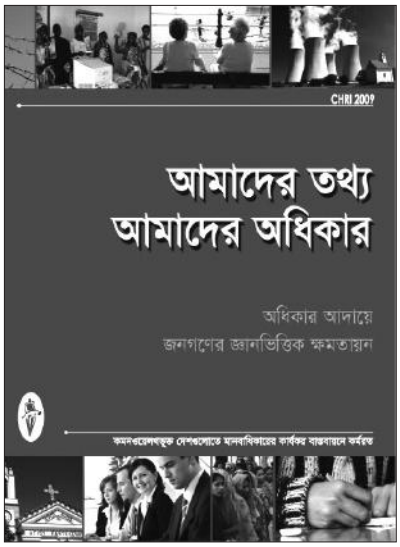

ভূমিকা পালন করছে তার ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু কেইস স্ট্যাডি নিয়ে বইটি ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)- এর উদ্যোগে। মূল গবেষণা ও গ্রন্থনায় ছিলেন সিসিলিয়া বার্গম্যান, ক্যারি গেইজ, ক্লেয়ার ক্রোনিন এবং রেশমী মিত্র। সম্পাদনা করেছেন মাজা দারুওয়ালা এবং ভেঙ্কটেস নায়েক। সম্প্রতি এই বইটির বাংলায় ভাষান্তর প্রকাশিত হয়েছে মানবাধিকার সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ থেকে। বইটির অনুবাদ করেছেন সাংবাদিক আলতাফ পারভেজ ও মিজান আলী।

পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশসমূহে তথ্য অধিকারের প্রয়োগ বেশ সুপরিচিত এক অনুশীলন। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতেও এখন এই আইনের প্রয়োগ রাষ্ট্রযন্ত্রে জনগণের অংশীদারিত্ব কীভাবে নিশ্চিত করছে তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। যেমন, জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ভূট্টা, যা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা– ২০০১-২০০৪ সালের দিকে তা যখন মানব খাদ্যের লেবেল লাগিয়ে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে বিতরণ করা হচ্ছিলো, তখন সেখানকার একটিভিস্টরা বিষয়টি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে ঐ সময় বিষয়টি 'কর্নগেইট কেলেঙ্কারি' নামে পরিচিতি পায়। চাপের মুখে ঐ দুই দেশের সরকার তখন জনগণকে খাদ্য সামগ্রী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানাতে বাধ্য হয় এবং এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বাধ্যবাধকতার জন্য নতুন আইন তৈরী করে।

জানার অধিকার সম্পর্কিত একই ধরনের আইনকে কাজে লাগিয়ে স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার ঘুষ আর দুর্নীতির চিত্র উন্মোচিত হয়েছে থাইল্যান্ডে ১৯৯৮ সালে। সেখানে ঘটনাটি ছিল নামকরা এক স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শেষে একজন অভিভাবক সকল পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ্যে ঘোষণার আবেদন জানালে কর্তৃপক্ষ 'এইরূপ নজির নেই' বলে দাবিটি অগ্রাহ্য করে। পরে ঐ অভিভাবক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আইনি লড়াই চালিয়ে যখন বিজয়ী হন তখন দেখা যায়, দুর্নীতির মাধ্যমে নামকরা স্কুলগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। তথ্যের এই উন্মোচন থাইল্যান্ডের পুরো ভর্তি পরীক্ষাকে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করেছিল।

বইটতে উলে-খিত এরকম অনেক দৃষ্টান্তের আরেকটি ছিল ভারতে কীভাবে তথ্য অধিকার আইন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে সে সম্পর্কিত। সেখানে নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সরকার রেশন কার্ড ব্যবস্থায় ভর্তুকি দিয়ে খাদ্য ও জ্বালানী সরবরাহ করলেও প্রথম দিকে দরিদ্র মানুষ সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতা ও অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমলাদের গোপন যোগসাজসের কারণে। একদিকে মানুষ রেশন দোকান থেকে 'পণ্য নেই' শুনে খালি হাতে ফিরে যেতেন– অন্যদিকে সেই পণ্যই খোলা বাজার থেকে উচ্চমূল্যে কিনতে হতো। আমলাদের অসহযোগিতায় রেশন কার্ড করাও ছিল কষ্টকর। এক পর্যায়ে ২০০৫ সালে গুজরাটে কিছু মানবাধিকার কর্মী তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ন্যায্যমূল্যে খাদ্য সরবরাহের সরকারি উদ্যোগটির আদেশ-নির্দেশের খুঁটিনাটি জানতে চেয়ে আবেদন করে আইনি লড়াই শুরু করে। প্রথমে আমলারা এ বিষয়ে তথ্য জানাতে বাধ্য নয় বলে অনীহা প্রকাশ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করলেও আবেদনকারীদের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কিত সরকারি নথি দেখাতে বাধ্য হন। ভারতে নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি শাস্তি ও জরিমানাযোগ্য করা হয়েছে। ন্যায্যমূল্য ব্যবস্থায় সরবরাহকৃত পণ্য সামগ্রী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে পরবর্তীকালে সেখানকার দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ সবলতা পায় এবং এই ব্যবস্থায় পণ্য পেতে ঘুষ-দুর্নীতির আধিক্যও তাতে অনেকাংশে কমে যায়।

বাংলাদেশে কিছু দিন হলো তথ্য অধিকার আইন হয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে সরকার একটি কমিশনও গঠন করেছে। কিন্তু এখনো এই আইনের চর্চা শুরু না হওয়ায় জনগণ এর প্রকৃত সুবিধা ও সুফল ভোগ করতে পারছে না। বর্তমান গ্রন্থের অভিজ্ঞতা ও কেইস স্ট্যাডিগুলো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের জন্য নির্দেশনামূলক হতে পারে। কোন ধরনের বিরুপ পরিবেশে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

তথ্য অধিকার জ্ঞানভিত্তিক সমাজের অতি জরুরি উপাদান। বর্তমান যুগে তথ্যই হলো শক্তি ও ক্ষমতায়নের উৎস। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। সচেতন জনগণও এ বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। তথ্য অধিকার আইন হওয়া সেক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রগতি। এখন প্রয়োজন, এই আইনকে ব্যবহার করে নাগরিক অধিকারের পরিধি বাড়ানো এবং রাষ্ট্র প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের পথ করে নেয়া। সেই ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ আমাদের সহায়তা করতে পারে। ◻

প্রকাশনা বিভাগ: নাগরিক উদ্যোগ

গণমানুষের সাংস্কৃতিক সহযোদ্ধা 'উদীচী'

মেহনতি মানুষের জয়গান গাইবার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর জন্ম হয় উদীচীর। খুব হঠাৎ করেই যে উদীচী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা কিন্তু নয়। এই ক্ষেত্রে স্মরণ করতে হবে ষোলঘরে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলনের কথা, যাকে কেন্দ্র করেই একটি গানের দল গঠনের চিন্তা প্রথম এসেছিল উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন সেনের মাথায়। এই সম্মেলনেই তার লেখা কিছু গণ সংগীত খালি গলায় পরিবেশন করা হয়। স্মরণ করতে হবে 'সৃজনী'কে। যে সংগঠনের অফিস প্রথম দিনই বন্ধ হয়ে যায় বাড়িওয়ালার ধমকে। তবু অবিরাম চেষ্টা চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে শিল্পী সাইদুল ইসলামের নারিন্দার বাসায় সত্যেন সেনসহ ছয়জন মিলে 'ওরে ওরে বঞ্চিত সর্বহারা দল' গানের রিহার্সালের মাধ্যমে 'উদীচী'র যাত্রা শুরু হয়। পরে অবশ্য পীর হাবিবুর রহমানের সহায়তায় ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চলে একটি জায়গা পাওয়ার পরই সত্যেন সেন সংগঠনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন 'উদীচী'; উত্তর আকাশের নক্ষত্র। সংগঠকদের বুকে স্বপ্ন ছিল– বাংলার নিপীড়িত মানুষের প্রাণের একতারায় যে সুর বেজে উঠে উদীচীর হবে সেই সুর, মেহনতি মানুষের হাতিয়ারে যে অনুরণন হয় উদীচীর কথা হবে সেই কথা।

এই চেতনা লালন করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সংগঠনটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সংগঠনের নীতি আদর্শের প্রতি অনুগত যেকোন বয়সের মুক্তবুদ্ধি এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তি উদীচীর সদস্য হতে পারে। বর্তমানে এই সংগঠনের দেশব্যাপী ১৯৬টি শাখা সংগঠন এবং দেশের বাইরে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ফ্রান্সে ৬টিসহ মোট ২০২টি শাখা সংগঠন রয়েছে।

উদীচীর নেতা-কর্মী ভাই-বোনেরা তাদের গণমুখী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়ে দেশের মানুষের নিকটস্থ হচ্ছে। উদীচী গান, নাটক এবং আবৃত্তির মাধ্যমে শোষিত মানুষের প্রতি বিশেষ মহলের বঞ্চনার কথা, তাকে ঠকিয়ে অগাধ সম্পদের মালিক হওয়ার কূটচালের কথা তুলে ধরে। সারাদেশে এই সংগঠনের ২৫-৩০টি গানের স্কুল রয়েছে। এই সংগঠনের রয়েছে নাটকের নিজস্ব পরিবেশনা এবং প্রযোজনা। উদীচীর উলে-খযোগ্য পথনাটক এবং মঞ্চনাটকের তালিকায় রয়েছে শপথ নিলাম, সামনে লড়াই, রক্তের ইতিহাস, সাচ্চা মানুষ চাই, দিন বদলের পালা, পুনরুত্থান, তাতাল, দেওয়ালে লিখন, তেভাগার পালা, রাজাকারের পাঁচালী, অভিযান, আলো আসছে, হইতে সাবধান, অভিশপ্ত নাগরী, চিরকুমার সভা, চিলেকোঠার সেপাই, বৌবসন্তি, হাফআখড়াই ইত্যাদি।

উদীচী বাঙালীর সুপ্ত অথচ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতা ও কল্যাণ চিন্তার মর্মবাণী নিয়ে হাজির হয় নতুনভাবে। এজন্য উদীচীর বিভিন্ন শাখা

> বাংলার নিপীড়িত মানুষের প্রাণের একতারায় যে সুর বেজে উঠে উদীচীর হবে সেই সুর, মেহনতি মানুষের হাতিয়ারে যে অনুরণন হয় উদীচীর কথা হবে সেই কথা।

বাংলার ঐতিহবাহী নববর্ষ বরণ, বর্ষা উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, বাউল মেলা, ভাষা সৈনিক-গুণীজনদের সম্বর্ধনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে যাচ্ছে দেশের মানুষকে। এছাড়াও সংগঠনটি বিগত সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, নানা দিবস বিশেষত মে দিবস পালন, সত্যেন সেন জন্ম বর্ষ উদযাপন ও সত্যেন মেলা, গণসাহিত্য উৎসব, রক্তদান কার্যক্রম, পাঠচক্র, সংস্কৃতিখাতে বরাদ্দবৃদ্ধির দাবিতে রাজপথে মিছিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে জনমত গঠন এবং সরকারকে চাপ সৃষ্টির মত কাজে বিভিন্ন চিন্তাকে এক সূত্রে গেঁথে শান্তি ও কল্যাণের মালা গড়ে তুলছে।

উদীচী একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হলেও তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। যেখানেই সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সামরিকতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, পুঁজিবাদের আস্ফালন সেখানেই প্রতিরোধের নীতিগত অবস্থান উদীচীর। এই কারণেই পাকিস্তান আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বার বার শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর রোষানলের শিকার হয়েছে উদীচী। নেতাকর্মীদের উপর নেমে এসেছে জেল-জুলুম, শারীরিক নির্যাতন ও হত্যার মত বর্বরতা। ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ যশোরে উদীচীর দ্বাদশ সম্মেলন এবং ২০০৫ সালের ৮ ডিসেম্বর নেত্রকোনায় নেতৃকর্মীদের উপর বোমা হামলা করে মৃত্যু ঘটানো আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। এসকল ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বার বার সংগঠনের সাথে এক হয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষ। প্রত্যাখান করেছে আদালতের দেওয়া ভিত্তিহীন রায়।

মানুষ এবং মানবতার যেকোন বিপদে পাশে দাঁড়ায় এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। '৭০ - এর জলোচ্ছ্বাস, '৭৪ - এর দুর্ভিক্ষ থেকে শুরু করে সিডর-আইলা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দুর্যোগে কাজ করেছে উদীচী। ২০০৭ সালের শেষের দিকে সিডর দুর্গতদের সাহায্যে উদীচী তার নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ রেখে ত্রাণ সংগ্রহে নেমে পড়ে। ১৮ নভেম্বর ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে একটি দল ছুটে যায় বাগেরহাটের সাউথখালী এবং বরগুনায়। সাউথখালীতে ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে এক মাস লঙ্গরখানা পরিচালানা করে। এছাড়াও সংগঠনটি দেশ-বিদেশের কর্মীদের সহায়তায় সিডর আক্রান্ত নানা অঞ্চলের দুঃস্থ নারীদের ছাগল কিনে দেওয়া, পুরানো নতুন জামা-কাপড়, কম্বল, ২ হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে বই-খাতা প্রদান, হারিকেন প্রদান, নগদ সহায়তা এবং শুকনো খাবারসহ ১৯,৪৬,৬৭৬ টাকা ত্রাণ বিতরণ করে।

এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি উদীচীর সমস্যা বা অপূর্ণতার অন্ত নেই। প্রয়োজনীয় লোকবল এবং অর্থবল দুটোরই সমস্যা। প্রতিষ্ঠাতাদের স্বপ্ন ছিল যেখানে কোন সংগঠন যেতে পারেনা সেখানে পৌঁছুবে উদীচী। দেশের প্রান্তিক মানুষের বিকল্প বিনোদন চর্চার আধার হবে এই সংগঠন। কিন্তু সংগঠন এতো বছর পরেও এখনো সেখানে যেতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই শহর কেন্দ্রিক। সেই সীমাবদ্ধতা জয় করে বাংলার সর্বত্র সৌরভ ছড়াবে উদীচী এটাই প্রত্যাশা। ◻

সোমা দত্ত : নাগরিক উদ্যোগে কর্মরত।

(লেখাটি সংগঠনের সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ ইদুর সাথে আলাপ এবং বিভিন্ন প্রকাশনার সহায়তায় লিখিত)

সংবাদপত্রভিত্তিক প্রতিবেদন

সমকালীন মানবাধিকার লংঘন চিত্র

বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরও এর তেমন উন্নতি ঘটেনি। প্রতিটি সরকারের আমলেই আইন-বহির্ভূতভাবে গ্রেফতার, আটক ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে। দেশের মানবাধিকার সংগঠন ও সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে এর নিরন্তর প্রতিবাদ অব্যাহত থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকেই তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।' অনুচ্ছেদ ২৭ এ বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' এছাড়া ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারী কার্যবিধি ৫৪ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা যাবে না– মর্মে রায় প্রদান করেছে। বাংলাদেশ CAT (Convention Against Torture), ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights, CEDAW (Convention of Elimination all kind of Discrimination against Women) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ। তা সত্ত্বেও মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে সর্বত্র। কিন্তু এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন তাহলো এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। জানুয়ারি '০৯ - জুন '০৯ পর্যন্ত সারাদেশে মানবাধিকার লংঘনের চিত্র:

বিচার বহির্ভূত হত্যা

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৪জন র‍্যাব, বাকীরা পুলিশি নির্যাতন, র‍্যাব পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আনসারের হাতে এবং কাস্টডিতে নিহত হয়েছে।

কারাগারে মৃত্যু

এই সময়ে কারাগারে অসুস্থতা বা বিভিন্ন কারণে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ধর্ষণ

১৮৩ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৮৯ জন নারী এবং ৯৪ জন শিশু। এরমধ্যে ২৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৩৬ জন গণ ধর্ষণের

শিকার হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৪ জন পুলিশ সদস্য একজন আদিবাসী নারীকে গণ ধর্ষণ করে।

যৌতুক

এ পর্যন্ত যৌতুকের শিকার হয়েছেন ১২৮ জন নারী। এর মধ্যে মারা গেছে প্রায় অর্ধশতাধিক। ৪ জন অত্যাচার সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

এসিড সন্ত্রাস

এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ৪৫ জন। এর মধ্যে ২৪ জন নারী, ৭ জন কন্যাশিশু, ১২ জন পুরুষ ও ২ জন কিশোর।

উচ্ছেদ

সম্পতি নওগাঁয় এক সাংসদ আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। দিনাজপুরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোন পুনর্বাসন ছাড়াই ১১৩ পরিবারকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে।

ফতোয়া

দেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্রাম্য সালিসে নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছে এবং দোররা মারার ঘটনা ঘটেছে। ফতোয়ার মাধ্যমে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে, গ্রাম থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, পরিবারকে একঘরে করা হচ্ছে। কুমিল-ার দাউদকান্দিতে এক অবিবাহিত নারীকে মা হওয়ার কারণে নির্যাতন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ধর্ষণের শিকার এক নারী মামলা করায় গ্রাম সালিসে তাকে শতাধিক বেত্রাঘাত করা হয়েছে। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ও গর্ভপাতের ঘটনায় মা ও মেয়েকে দোররা মারা হয়েছে। আমি নিশ্চিত এই রকম ঘটনা আরো অনেক বেশি ঘটেছে। যা পত্র-পত্রিকায় হয়ত আসেনি। ২০০১ সালের ২ জানুয়ারি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করা হলেও নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। এ ব্যাপারে আরো কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

এছাড়া সারা দেশে কিছু রাজনৈতিক সহিংসতা, শ্রমিকদের অধিকার লংঘন এবং সাংবাদিকদের প্রতি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর বিডিআর সদস্যদের জিজ্ঞসাবাদের সময়ে নির্যাতন এবং নির্যাতিত সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে আত্মহত্যা বা হার্ট এ্যাটাকের কথা বলা হলেও তা অনেকের কাছেই প্রশ্নবিদ্ধ।

দেশে মানবাধিকার লংঘন রোধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আরও সক্রিয় করা প্রয়োজন। প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা। তবেই সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ◻

মাহবুবা আক্তার: মানবাধিকার কর্মী

ইউনিভার্সেল পিরিওডিক রিভিউ বিষয়ে জাতীয় মতবিনিময় সভা

গত ৭ জুন ২০০৯ ধানমন্ডির ডবি-ওভিএ মিলনায়তনে হিউম্যান রাইটস্ ফোরাম অন ইউপিআর, বাংলাদেশ-এর আয়োজনে 'পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আয়োজনে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এডভোকেট সুলতানা কামাল, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন। স্টেপস-এর নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন কর্মকারের সঞ্চালনায় মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ইউপিআর ফোরামের সমন্বয়ক সাঈদ আহমেদ।

সাঈদ আহমেদ বলেন, গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ উপস্থাপিত 'ইউপিআর' প্রতিবেদনের যে সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে তা সন্নিবেশ করেই আজকের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিবেদনটিতে হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর ফোরামের এডভোকেসি কার্যক্রম, বাংলাদেশের পূণর্বীক্ষণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৯, ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতন, শিক্ষার অধিকার, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নিরপেক্ষ বিচার পাওয়ার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার, শ্রমিক অধিকার, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির কাছে অভিবাসী শ্রমিকের নিরাপত্তা, দেশের বিভিন্ন স্থানে ফতোয়ার দেওয়ার ঘটনা, হিউম্যান রাইটস কমিশন বিকেন্দ্রীকরণ, যৌন শ্রমিকদের বঞ্চনা, পুলিশ বাহিনীকে সংবেদনশীল করা, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, চিন্তাভাবনা পরিবর্তন না করে 'বিডিআর' এর পোশাক পরিবর্তন কোন সুফল বয়ে আনবে কিনা, গৃহ কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন, সিডোর সংরক্ষণ তুলে নেয়া, যুদ্ধাপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনা, দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা, পুলিশ বিভাগের খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চান।

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই সকল প্রশ্নে সরকারের ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তার সরকার জনগণের অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। বিগত চার বছরের কার্যক্রম নিয়ে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ রিভিউ রিপোর্ট তৈরি করেছে। বর্তমান সরকার বিগত বছরে ঘটে যাওয়া মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা 'ডিফেন্ড' করেনি এবং একই সাথে এই সরকারের অঙ্গীকার 'ইউপিআর'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর পরবর্তী চার মাসের কার্যক্রম এবং ইতিবাচক উদ্যোগের তথ্য সংযুক্ত করে নতুন প্রতিবেদন প্রস্তুতের কথা বলেন। তবে তিনি তার মন্ত্রণালয়ের বাইরের বিষয়ে মত প্রদানে বিরত থাকেন।

এডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, দেশের প্রতিটি ব্যক্তির মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অথচ প্রতি মুহূর্তে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, দোররা, ফতোয়ার মাধ্যমে ভয়াবহ মানবাধিকার বিপর্যয় হচ্ছে। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মাধ্যমে এই বিষয়ে আমাদের ভাবনা এবং দেশের পরিস্থিতি সরকারের সামনে তুলে ধরা হলো। তিনি তার নিজস্ব মন্ত্রণালয় ও ফোরামে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবেন এটাই প্রত্যাশা।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ইউপিআর ফোরাম সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। সেজন্য আজকের এই মতবিনিময় সভার আয়োজন। তিনি সরকারের প্রতি মানবাধিকার কমিশনসহ সকল প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত করা, বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হওয়াসহ নির্বাচনী ইশতেহার-এর সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

জাকির হোসেন বলেন, বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় ৫৫ লক্ষ দলিত জনগোষ্ঠী যারা প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘনের শিকার। এছাড়াও গৃহে কর্মরত শ্রমজীবীদের এখনো আইনে কোন স্বীকৃতি নেই। তারা কর্মের নিরাপত্তা, পরিবেশ, স্বাস্থ্যসহ নানা বঞ্চনায় জর্জড়িত। ইউপিআর প্রতিবেদনেও এবিষয়ে উলে-খ করা হয়েছে। আমরা তাদের মানবাধিকার রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি।

উলে-খ্য যে, উক্ত মতবিনিময় সভায় বিশিষ্ট নারীনেত্রী, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ◻

মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত মে-জুন ২০০৯ নাগরিক উদ্যোগের ৯টি কর্ম এলাকায় মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনগুলোর প্রথম পর্বে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সদস্য এবং নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার ও শে-াগানে মুখরিত করে নিজ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। এই শে-াগানগুলো হলো–মুখে মুখে তালাক নয়, দেশের আইন তাই কয়; সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোল, মাদক-জুয়া বন্ধ কর; মানবাধিকার রক্ষা কর, আন্দোলন গড়ে তোল; নারীর অধিকার মানবাধিকার, এই অধিকার রক্ষা কর ইত্যাদি। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভায় সংশি-ষ্ট কর্ম এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের প্রতিনিধিরা তাদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন তুলে ধরেন। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, সমাজসেবা কর্মকর্তা, মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল এবং তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ। সম্মেলনে আগামী এক বছরের জন্য এলাকাভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

২৪ মে ২০০৯ রংপুর সদর উপজেলার মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সম্মেলন রংপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার মঞ্জুর-ই-মওলা। এতে মোট ১৮১ জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। ৯ জুন ২০০৯ বদরগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তনে ১৯০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপজেলা চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ সরকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১১ জুন ২০০৯ কালিহাতি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সম্মেলনে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী মীর মাহফুজুর রহমান। এতে ১২৯ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৪ জুন ২০০৯ বরিশাল সদর, মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর এবং টাঙ্গাইল সদর উপজেলা মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরিশালে ১৬৪ জন নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আজিজুল হক আক্কাস। শ্রীনগর উপজেলা মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের সম্মেলনে ২২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সোহেলা পারভীন রানু। টাঙ্গাইল সদরের সম্মেলনে অতিথি ছিলেন সাধারণ গ্রন্থাগারের সহ সভাপতি খন্দকার নাজিম উদ্দিন। উপস্থিতি ছিল ১৪২ জন। স্বরূপকাঠীতে গত ১৫ জুন ২০০৯ বিআরডিবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৬ জুন ২০০৯ রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া এবং বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাচড়ার সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ক্ষ্যান্ত রানী রায়। বানারীপাড়া অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১০৮ জন নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ।

সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বলেন, নাগরিক উদ্যোগের সহায়তায় সৃষ্ট 'মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের' সদস্যরা সালিশকে আইন সম্মতভাবে সম্পাদন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরাও চাই আপনারা এই কাজটি ভালভাবে সম্পাদন করুন। আপনারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রসংশনীয়। এলাকার মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনারা কাজ করছেন, যা অন্যতম ইতিবাচক দিক। আমরা মনে করি, আপনারা এই কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন। আমরা যে যেখানে দায়িত্ব পালন করছি সেই অবস্থান থেকে আপনাদের সহযোগিতা করার প্রত্যয় করছি। এই সম্মেলন থেকে উলে-খযোগ্য অর্জন হলো– সুশৃংখল পরিবেশে কমিটি গঠন এবং ঘোষণা, যা সাংগঠনিক শৃংখলার প্রকাশ। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, চেয়ারম্যানদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে; মানবাধিবাধিকার পর্যবেক্ষণ দলের নারী সদস্যদের সক্রিয়তা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে; ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বক্তব্যে সংগঠনকে ধারণ করার বিষয় লক্ষ্য করা গেছে; নিজেদের সবলতা-দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। ◻

টেমসেট সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুতে রিড ফার্মা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী প্যারাসিটামলের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান রিড ফার্মা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২৯ আগস্ট ২০০৯ জাতীয় জাদুঘরের সামনে নাগরিক উদ্যোগ ও পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন (পাওয়া) যৌথভাবে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করে।

মানববন্ধনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে 'বাপা'র নির্বাহী কমিটির সদস্য জাহিদুর রহমান বলেন, গত জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত রিড ফার্মার টেমসেট সিরাপ খেয়ে মোট ২৮ জন শিশু মারা গেছে। এর ভয়াবহতা বোধ হয় আমরা অনেকেই অনুভব করতে পারছি না। যে কারণে আমরা ব্যক্তিগত এবং সরকারি পর্যায়ে এখনো তেমন কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ দেখতে পাচ্ছি না। এই নিরবতা দ্রুত ভাঙ্গা উচিত। নইলে হয়তো আরো শিশুর অকাল মৃত্যু হবে।

নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন বলেন, এই ঘটনা দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতির প্রতিফলন। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য একটি অধিকার, সরকারকে সেই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য অতি দ্রুত একটি গণমুখী স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং স্বাস্থ্য খাতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

পাওয়ার সমন্বয়কারি সাকিলা রুমা বলেন, ভেজাল প্যারাসিটামল সেবনে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং দেশের মানুষের নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

মানববন্ধনে রিড ফার্মা কর্তৃপক্ষকে দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিল, শিশুমৃত্যুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ দান, স্বাস্থ্যসেবায় ও ঔষধ প্রস্তুতের মান নিয়ন্ত্রণে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ সংশোধনের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ, প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য নীতি গণমুখী করা, 'স্বাস্থ্য সেবা কোন পণ্য নয়–এটা মানুষের অধিকার' স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে এই নীতি অনুসরণ করা, স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করা, স্বাস্থ্য খাত বেসরকারিকরণ বন্ধ, ইত্যাদি দাবি করা হয়। মানববন্ধনে আরো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, খিলগাঁও সামাজিক সংস্থার হাফিজুর রহমান ময়না, গ্রিন ভয়েসের সমন্বয়কারি আলমগীর কবির, পাওয়ার সহযোগি সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি জাহানারা বেগম, লাভলী ইয়াসমিন, ফিরোজা বেগম, মনিরাণী দাস প্রমুখ। ◻

দলগত আলোচনা

নাগরিক উদ্যোগের ৯ টি কর্ম এলাকায় গত এপ্রিল '০৯ থেকে সেপ্টেম্বর '০৯ পর্যন্ত মোট ৫৩৬টি দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসকল আলোচনায় তৃণমূল পর্যায়ের ১৪,৪৬০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় গ্রহণকারীরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই আলোচনার মাধ্যমে তারা মুসলিম বিয়ের শর্তসমূহ, তালাকের পদ্ধতি, দেনমোহর, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, নারীর বর্তমান সামাজিক মর্যদা, জাতিসংঘ ঘোষণাসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে পেরেছেন। তারা আরো বলেন, দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্য তথ্য তাদেরকে বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে। এছাড়াও এই আলোচনায় আসার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের সুসম্পর্ক তৈরী ও ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হয়েছে। তাদের কেউ কেউ নারীর অধিকার, বৈষম্যদূরীকরণ এবং হিন্দু নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক সঙ্গে আন্দোলনের কথা ব্যক্ত করেন। উলে-খ্য, এই সকল সভায় নারীদের পাশাপাশি পুরুষের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ◻

সুযোগ বঞ্চিত নারীদের সভা

গত এপ্রিল ০৯-সেপ্টেম্বর ০৯ পর্যন্ত সুযোগ বঞ্চিত নারীদলের মোট ১৩৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৯৫০ জন নারী উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ বঞ্চিত নারীরা এই সভাগুলোতে তাদের অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠী হয়েও তারা সরকারি অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের জীবন অনেক সংগ্রামের। তারা সুখের আশায় ভাসমানভাবে বিভিন্ন কাজ, কখনো ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবীকা নির্বাহ করছেন। নাগরিক উদ্যোগের আয়োজনে এসকল সভার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের সামাজিক সুযোগ-সুবিধামূলক কার্যক্রম বিষয়ে জানতে পেরেছেন। তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্ক এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল তাদের ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকেন। এই নারী দলের সদস্যরা মোমবাতি তৈরীর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ◻

জনগণের স্বার্থে তথ্য অধিকার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

বাংলাদেশ নামের এই প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। জনগণের সকল তথ্য জানার অধিকার আছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। তাই দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে তথ্য অধিকার আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। গত ৩ মে ২০০৯ জাতীয় প্রেসক্লাব কনফারেন্স লাউঞ্জে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০০৯ উপলক্ষ্যে নাগরিক উদ্যোগের সহায়তায় তথ্য অধিকার আন্দোলন আয়োজিত 'তথ্য অধিকার আইন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এএসএম শাহজাহান। আলোচনা করেন দৈনিক সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, এএলআরডি এর নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন, সংগঠনের সদস্য সচিব জাকির হোসেন ও উন্নয়ন ধারা ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক আমিনুর রসুল।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দৈনিক সংবাদের রিপোর্টার নিখিল ভদ্র। তিনি তার প্রবন্ধে বলেন, নানা আইনের মারপ্যাঁচে সংবাদ কর্মীদের জন্য তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করলেও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নামে অনেক তথ্য সংগ্রহ সাংবাদিকদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

এএসএম শাহজাহান বলেন, সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। তাই গণমাধ্যমের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এর সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারকে আইনের সীমাবদ্ধতাগুলোও যাচাই করতে হবে।

মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী সবচেয়ে বড় সংস্থা সরকার। এই আইনের ফলে সরকারের তথ্য দেয়ার সদিচ্ছার প্রকাশ পেয়েছে যা একটি ইতিবাচক দিক। তিনি আরো বলেন, এই আইন সাংবাদিকদের আইন নয় এটি জনগণের আইন। এর মাধ্যমে রাষ্টীয় ও বেসরকারি সংগঠনের সকল উন্নয়ন কার্যক্রম ও আয় ব্যয়ের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা ঐ সকল সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

তথ্য অধিকার আন্দোলনের সদস্য সচিব জাকির হোসেন বলেন, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত না হলে তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। এই আইনের সুফল পেতে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। এর দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। তিনি তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, আইনে বলা হয়েছে যেসকল তথ্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ সেসকল তথ্য দেয়া যাবে না। আইনের এই অংশ ব্যবহার করে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। তাই এই আইনে সংশোধন আনা প্রয়োজন।

এএলআরডি এর নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, দেশের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এর যথাযথ সুফল পেতে এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। গণতন্ত্র সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে এই আইনের সফল প্রয়োগ ভূমিকা রাখতে পারে।

সেমিনারে উন্নয়ন কর্মী, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ◻

সালিশী পরিষদ ও ইউপির অন্যান্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে সভা

স্থানীয় পর্যায়ে পারিবারিক বিবাদ মীমাংসার সহজ এবং কার্যকর স্থান ইউনিয়ন পরিষদের সালিশী পরিষদ। নাগরিক উদ্যোগ সালিশী পরিষদকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই পরিষদের সাথে সভা এবং অরিয়েন্টেশনসহ অন্যান্য কমিটির সাথেও সভার আয়োজন করে থাকে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকায় সালিশী পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত তালাক, ভরণপোষণ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিবাদ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য পাঠিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এপ্রিল ০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ০৯ পর্যন্ত ৫টি কর্মএলাকায় সালিশী পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য কমিটির সাথে ২০০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে মোট ১৩৬১ জন পুরুষ এবং ৩৮৩ জন নারী উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এলাকার জনগণের সম্পর্কের একটি সেতুবন্ধন হয়েছে। এছাড়াও এসকল সভায় এলাকর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। ◻

‘দক্ষিণ এশিয়ার দলিত অধিকার আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক সংহতি’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠির অধিকার আন্দোলনের আয়োজনে ‘দক্ষিণ এশিয়ার দলিত অধিকার আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক সংহতি’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ১৭ জুন ২০০৯ ওয়াইডাবি-উসিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপ্রধান ছিলেন নাগরিক উদ্যোগের সভাপতি অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ। উপস্থিত ছিলেন ফেমিনিষ্ট দলিত অর্গানাইজেশনের সভাপতি দূর্গা সব, পিপলস ওয়াচের পরিচালক হেনরি টিফেঙ্গে এবং IDSN সমন্বয়কারি রিকি নরলিন্ড, সংগঠনের উপদেষ্টা জাকির হোসেন এবং অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম, বিডিইআরএমের নেতা মুকুল সিকদার, বি.শলোমান, এ্যাডভোকেট বাবুল রবিদাস, উত্তম কুমার ভক্ত, মনি রানী দাস এবং দলিত জনগোষ্ঠীর ৫১ জন প্রতিনিধি।

জাকির হোসেন তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আজ নেপাল ভারতসহ আন্তর্জাতিক দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়েছি। আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আমরা বুঝতে চাই ঐসব দেশে কীভাবে দলিত আন্দোলন এগিয়েছে।

হেনরি টিফিঙ্গে বলেন, ভারতের দলিতরা কেবল নিজেদের অধিকারের কথা বলছে না, তারা নিজেদের রাজনৈতিক দলও তৈরী করেছে। তবে আজকের অবস্থায় আসতে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে।

দূর্গা সব বলেন, নেপাল, ভুটান ভারতসহ এশিয়ার কিছু দেশে গোত্র ভেদে বঞ্চনা একটি বড় সমস্যা। নেপালে ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দলিতরা সংগঠিত হয়েছে।

দলিত নেতা বিভূতোষ রায় বলেন, ধর্ম বা গোত্রভেদে মুক্তি পেতে সচেতনা তৈরীর পাশাপাশি মানসিকতা প্রস্তুত করতে হবে।

রিকি নরলিন্ড বলেন, দলিত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রসারিত করার জন্য নেপাল ভারত ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইডিএসএন ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাথে দলিত বিষয়ে কাজ করছে।

অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, দলিত আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিশেষত দলিত নারীদের নিয়ে দূর্গার কাজ আমাদের দিকনির্দেশনা দিবে।

সভাপতি খান সারওয়ার মুরশিদ দলিত আন্দোলনকারী বক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ভারত ও নেপালের দলিত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। যেকোন আন্দোলন সফল করতে দরকার ঐক্য, তথ্য, অভিজ্ঞা। এদেশে যারা দলিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের এই দক্ষতাগুলো অর্জন করতে হবে। ◻

পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে মতবিনিময়

মানবাধিকার সংস্থা নাগরিক উদ্যোগের আয়োজনে গত ২৫ মে ২০০৯ ‘পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয়’– শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি খন্দকার নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জামিলা খাতুন, অধ্যক্ষ ইউসুফ আলী, টাঙ্গাইল ক্লাবের সহসভাপতি হারুন অর রশিদ, চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ফারুক, নাগরিক উদ্যোগের প্রকল্প ব্যবস্থাপক বৃত্বা রায়, মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল এবং তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন নাগরিক উদ্যোগের উর্ধ্বতন কর্মসূচি কর্মকর্তা অমিত রঞ্জন দে। মতবিনিময় সভাটি পরিচালনা করেন এরিয়া অফিসার জাহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামিলা খাতুন বলেন, আমরা যদি আমাদের ঘরকে মানবিকতা, ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক থেকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারি তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। তিনি বলেন, নারীদের শিক্ষার হার বাড়িয়ে এবং দক্ষ করার মাধমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে পারলে পরিবারে নারীর মর্যাদা বাড়ানো সম্ভব। সভাপতির বক্তব্যে খন্দকার নাজিম উদ্দিন বলেন, আমাদের চেতনায় এক ধরনের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। তাই শুধু আইন প্রণয়ন করেই নয় পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক বৃত্বা রায় বলেন, পরিবার হচ্ছে মানুষের নিরাপদ আশ্রয় এবং সেই দিক থেকে এটি একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। আমরা নানা নির্যাতনের কেন্দ্রে পরিণত করে এই প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করতে পারিনা। আমরা নিজেরাই পারি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি নির্যাতনমুক্ত পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে। পরিবারে নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রয়েছে। আজকের এই সভা থেকে আমরা পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে একটি কার্যকর আইন প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন দাবি করছি। তবে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ◻

কে ই স স্ট্যা ডি

‘নারী মানেই ঘরে বসে থাকা’- এই ধারণা পাল্টে দিতে চান পারুল

মঙ্গা কবলিত রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে। অভাব-অনাটন, সমস্যা-সংকট এখানকার মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। এই উপজেলার একটি ইউনিয়ন লক্ষ্মীটারী। লক্ষ্মীটারীর বুক চিরে বেরিয়ে গেছে তিস্তা নদী। তিস্তার ভাঙ্গন একের পর এক এলাকার মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করছে। এই ইউনিয়নেরই মান্দাইন গ্রামের এক অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে নুরুন্নাহার পারুল। পিতা মো. নুরুল ইসলাম কৃষিকাজ করেন এবং মা মোছা: রমিছা বেগম ঘর সংসার সামলান। আট ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম পারুল ১৯৯৯ সালে এসএসসি পাশ করেন। এ বছরই পাশের গ্রাম সরকারটারী গ্রামের আবুল হোসেন-এর সাথে তার বিয়ে হয়। তারপর আর লেখাপড়া করা হয়নি। বিয়ের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও তাদের ঘরে কোন সন্তান নেই। নিঃসন্তান পারুলের স্বামী-সংসার নিয়েই কাটত সারাদিন। এরপর ২০০৫ সালে নাগরিক উদ্যোগ মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য এলাকায় আসে। নাগরিক উদ্যোগের কমিউনিটি মবিলাইজার ফারুখের সাথে পরিচয় হয় পারুলের। ফারুখ তাকে এলাকার অসহায় নারীরা প্রতিনিয়ত অন্যায়-অবিচারের শিকার হচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা বলেন। তখন কোন কিছু চিন্তা না করে রাজী হয়ে যায় পারুল। তিনি নাগরিক উদ্যোগের নারীনেত্রী হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, আস্তে আস্তে আমার একধনের ভাল লাগা শুরু হয়। আমি যেন একটা অন্য এক জীবনের পথে পা বাড়িয়েছি। নাগরিক উদ্যোগ আমাকে এই এক অন্য পথের সান্ধান দেয়। এই সংগঠন আমাকে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, প্রশিক্ষণে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এখন আমি গ্রামের মাতুব্বরদের সামনে বসে কথা বলতে পারি, গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের অংশীদার হতে পারি।

পারুলের স্বামী গ্রামের একজন কৃষক। তিনি কোনদিন তার কোন কাজে বাঁধা দেননি। বরং সব সময় সহযোগিতা দিয়ে এসেছে। স্বামীর সহযোগীতা থাকায় তিনি নাগরিক উদ্যোগের সৃষ্টি নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হতে পেরেছেন। পারুল বলেন, এই সংগঠন থেকে আমি মানবাধিকার, বিচার ও সালিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছি। এই সকল প্রশিক্ষণ পেয়ে, কাজে যুক্ত হয়ে এই প্রথম আমি মানুষ হিসেবে সম্মানের সাথে বাঁচতে শিখলাম। আগে মেয়ে হিসেবে জন্ম নিয়েছি বলে নিজেকে খুব ছোট মনে হতো। ভাবতাম আমি মেয়ে, আমি আর কিই বা করতে পারি। এখন নিজেকে নতুন করে চিনলাম। এটি আমার জন্য বড় পাওয়া।

তবে আমি সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে অনুভব করলাম বাইরে এভাবে চলাফেরা করার জন্য পয়সা লাগে। অথচ আমার স্বামীর কৃষিকাজ থেকে সামন্য আয়। তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। তখন শুরু করলাম চাকরী খোঁজা। ব্র্যাকের পরিচালিত মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য প্রকল্পে চাকরীও পেয়ে গেলাম। এখন আমি সংসারে স্বামীকে সহযোগিতা করতে পারি। আবার ইচ্ছামত বিচার সালিশে যেতে পারি। এখন অনেক মানুষ আমাকে চেনে, কথা শুনে। এটি আমার জন্য বড় পাওয়া।

> গ্রামের সবাই জানে আমি ইউনিয়ন নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। সেই কারণে তারা আমার কাছে চলে আসে। এখানে এসে তারা খোলামেলা কথা বলতে পারে। যে কারণে প্রকৃত সমস্যা জানা যায়। সালিশেও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং ন্যায়বিচার পায়।

আগে একেবারেই বুঝতাম না, এখন আমার চোখ খুলেছে। পাশাপাশি এই যে ব্র্যাকের কাজে যুক্ত হয়েও বুঝতে পারছি মেয়েদের কী কষ্ট! তবে এই পর্যায়ে আসতে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম প্রথম আশেপাশের লোকজন নানা ধরনের ইঙ্গিত করে কথা বলতো। বলতো, ছেলেদের মত চলাচল করে, স্বামীর সংসারে মন নেই, স্বামী ছেড়ে অন্য পুরুষের সাথে চলাচল করে, ওর সাথে নিশ্চয়ই কিছু আছে। এরকম আরো কত মুখরোচক আলাপ আর কি।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগা এই যে, আগে গ্রামে ঝগড়া লাগলে থামানো মুশকিল ব্যাপার ছিল। প্রচুর মামলা হত। এখন তা নেই বললেও চলে। গ্রামের সমস্যা গ্রামেই সমাধান হয়ে যাচ্ছে। আগে নারীদের সমস্যা হলে যাওয়ারই কোন জায়গা ছিল না। মুখ বুঝে সকল অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছে। এখন গ্রামের সবাই জানে আমি ইউনিয়ন নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। সেই কারণে তারা আমার কাছে চলে আসে। এখানে এসে তারা খোলামেলা কথা বলতে পারে। যে কারণে প্রকৃত সমস্যা জানা যায়। সালিশেও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং ন্যায়বিচার পায়।

এছাড়াও আমি গ্রামে অন্যান্য বিবাদ মীমাংসায় উপস্থিত থাকি, মতামত দেই, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করি। আবার অনেক সময় জুরি বোর্ডেও থাকি। বর্তমানে ইউনিয়ন নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এখানে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন এবং তা থেকে একটা পরিচিতি আসার কারণে ২০০৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংক আমাকে গ্রাম পর্যায়ের দলনেত্রী হিসেবে মনোনীত করে। এরপর আমি যুক্ত হই জাগরণী চক্রের ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলগামী করার কাজের সাথে। সেখানে এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হই। আগামী দিনে আমি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। নারী মানেই ঘরে থাকতে হবে, সংসারের কাজ করতে হবে এ ধারণা পাল্টে দিতে চাই। যতদিন বেঁচে আছি মানুষের পাশে থাকতে চাই। ◻

‘ফতোয়া ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকারকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে’

দেররা ফতোয়াসহ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে গত ২০ জুন ২০০৯ জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে মানবাধিকার সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ ও পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন (পাওয়া)। মানববন্ধনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, ফতোয়া আইন ও মানবতা বিরোধী। ২০০১ সালের ১ জানয়ারি হাইকোর্টের এক যুগান্তকারী রায়ে ফতোয়াবাজী সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ কিছু স্বার্থান্বেসী মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘন করছে। তারা মানুষের সরল ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানছে এবং ধর্মচর্চাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এই ফতোয়াবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকারকে অনুরোধ জানান। এই সময় পাওয়া এবং নাগরিক উদ্যোগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ◻

ইউনিয়ন ও উপজেলা নারীনেত্রী সভা

এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৯ নাগরিক উদ্যোগের ৯টি কর্মএলাকায় তৃণমূল নারীনেত্রীদের ১৭৭টি ইউনিয়ন এবং ১৯টি উপজেলা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল সভায় ২৮৩৯ জন নারী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নারীনেত্রীরা বলেন, তারা উলে-খ্য সময়ে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ, মুখে মুখে তালাক বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, হিল-া বিয়ে এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। গত ১৫ জুন ২০০৯ রংপুর সদরের নারীনেত্রীরা আজিজনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্রীর গণধর্ষণের শিকার হওয়ার প্রতিবাদে রংপুর প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে অংশগ্রহণ এবং পুলিশ প্রশাসনকে স্মারকলিপি ও সংবাদ সম্মেলনের কপি দেন। উলে-খ্য যে, তৃণমূল নারীনেত্রী নেটওয়ার্কের সদস্যদের অনেকেই এখন স্থানীয় সরকার বিশেষত আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করছেন। ◻

সালিশ কার্যক্রম

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত নাগরিক উদ্যোগের ৯টি কর্মএলাকার নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে ‘সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার’ তথ্য:

বিষয়	পূর্বে অপেক্ষমান	অভিযোগ গ্রহণ	মোট সংখ্যা	মীমাংসা	বাতিল	মামলা	বর্তমানে অপেক্ষমান
পারিবারিক নির্যাতন	১৫৮	৪৪২	৬০০	৩৩৬	১১০	৩	১৫১
দেনমোহর	০৭	১৭	২৪	০৯	০১	০০	১৪
ভরণপোষণ	১০৬	১১৩	২১৯	৮৬	৬৪	০২	৬৭
বহু বিবাহ	১৮	১৯	৩৭	১৩	০৭	০৩	১৪
তালাক	১৩	২১	৩৪	১৬	০৮	০১	০৯
অভিভাবকত্ব দাবি	০০	০৩	০৩	০১	০০	০০	০২
দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার	২০	৭৫	৯৫	৩৪	৩২	০০	২৯
পৃথক বসবাস	০০	০১	০১	০১	০০	০০	০০
প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ	১৮	১১৪	১৩২	৯৪	০৯	০০	২৯
উত্ত্যক্ত করা	০০	১০	১০	০৭	০৩	০০	০০
জমি সংক্রান্ত বিরোধ	৫৮	৯৫	১৫৩	৭৯	৩২	০০	৪২
উত্তরাধিকার	০৯	০৬	১৫	০৪	০৪	০০	০৭
ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে বিরোধ	০১	০৯	১০	০৫	০২	০০	০৩
ব্যক্তিগত ঋণ বিষয়ে বিরোধ	১৪	৪৯	৬৩	৪০	০৬	০০	১৭
ক্ষতিপূরণ দাবি	০৬	২২	২৮	১৮	০৩	০০	০৭
চুরি	০১	১৪	১৫	১০	০২	০০	০৩
অন্যান্য	২০	৪২	৬২	২৫	১৫	০০	২২
মোট	**৪৪৯**	**১০৫২**	**১৫০১**	**৭৭৮**	**২৯৮**	**০৯**	**৪১৬**

* নাগরিক উদ্যোগের নিবন্ধনের বাইরে উলে-খিত সময়ে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল, ওয়ার্ড সালিশ কমিটি এবং নারীনেত্রীরা স্থানীয়ভাবে ৮১৮টি বিরোধ সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করেছেন।

শান্তি বজায় রাখুন
সর্ম্পক অটুট রাখুন
গ্রামের সমস্যা গ্রামেই মেটান
সালিশে বসুন
প্রচলিত আইনে সিদ্ধান্ত নিন।